চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার

অশোক কুমার দেওয়ান

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!
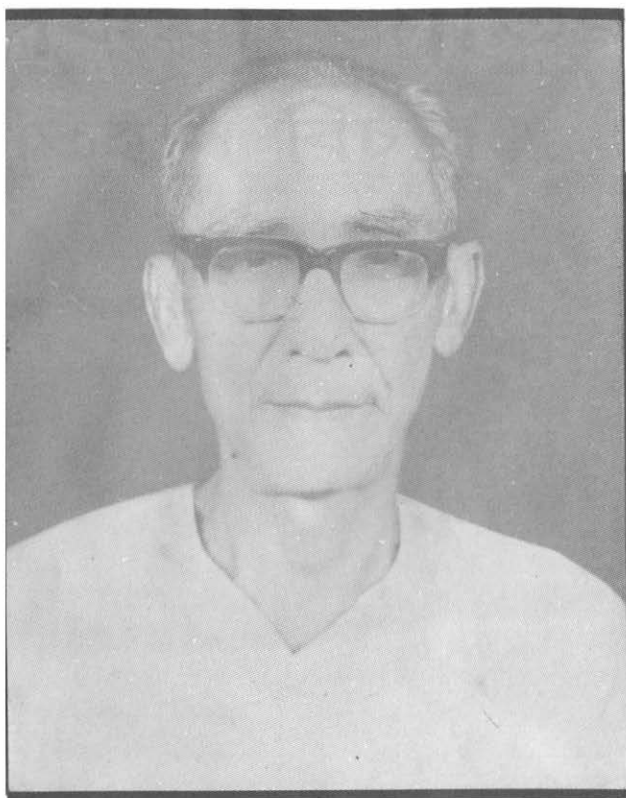
অশোক কুমার দেওয়ান
১৯২৬–১৯৯১

চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার

প্রথম অধ্যায়

অশোক কুমার দেওয়ান

Chakma Jatir Itihas Bichar
Ashok Kumar Dewan
First Published
1991

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৯১

প্রকাশক

মিসেস্ দিপীকা দেওয়ান
খবংপর্যা, খাগড়াছড়ি।

সত্বাধিকারী
চন্দন দেওয়ান
ভাস্কর দেওয়ান
স্বনির্ভর এলাকা, খাগড়াছড়ি
প্রচ্ছদঃ মঞ্জুর মোর্শেদ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সুসময় চাকমা

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
তিলোত্তমা মুদ্রণালয়
৪৪/৪৮, নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোনঃ২০৩২৭২
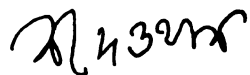
মূল্য ৬০/= (ষাট টাকা)।

প্রসঙ্গ কথা

চাকমা জাতির ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনাচার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার আগ্রহ গবেষণা অনুরাগীদের পর্যাপ্ত সুযোগ হয়ে উঠে না, তার মূলতঃ কারণ হচ্ছে তথ্য নির্ভর গ্রন্থের অভাববোধ। চাকমা জাতি বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে তারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বৈচিত্র মণ্ডিত রূপে মাধূর্য্য লাভ করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার উম্মোচন এবং বিকাশের দায়িত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষকদের। তাদেরই প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে Casuel Study করে গভীর ভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও শ্রমকে নিয়োজিত রেখে চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার নামে দু'খন্ডে একখানা পুস্তিকা রচনা করে খসড়া পান্ডুলিপি তৈরী করেছেন কিন্তু অনুকূল পরিবেশ এবং সময়ের অভাবে তা তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি।

প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান শুধু একজন চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট উপজাতীয় শিক্ষাবিদ এবং সকলের কাছে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সমাদৃত ব্যক্তি। পুস্তিকায় বর্ণিত তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের মানগত দিক বিচার করলে স্বজাতীয় লেখক হিসেবে সন্নিবেশিত তথ্যাবলী চাকমা জাতির ইতিহাস গবেষণায় দিক নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে তা নিঃসন্দেহ। ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের দৈন্যতা ও দুর্বলতা অনেককে নিরুৎসাহিত করবে। তবে এসবের কিছু কিছু অংশের দীপ্তবাণী অনুসন্ধিৎসু গবেষকের চিত্তে প্রবল উৎসাহ যোগাবে। পুস্তিকার মূল্যায়ন

ও যথার্থতার বিচারের জন্য চাকমা জাতির ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের কাছে উপস্থাপনের দায়িত্ব নিয়ে খাগড়াছড়ি'র উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌ষ্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা ও তরুণ গবেষক মিঃ সুসময় চাকমা পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়টি প্রকাশের সার্বিক পরিকল্পনা ও গ্রন্থনার কাজ তদারকি করে অবশেষে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে প্রয়াত লেখকের আত্মার প্রতি যে নিদর্শন স্থাপন করেছেন তার জন্যে তিনি সুধীজনের কাছে খুবই সমাদৃত হলেন। পুস্তিকাটি সকল পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হোক, গ্রহনীয় হোক এই আশা রেখে আমি প্রয়াত লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি–সে সাথে তাঁর চিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বর্গীয় সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

তারিখঃ ৩০শে নভেম্বর ১৯৯১ ইং
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

(সমীরণ দেওয়ান)
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রস্তাবনা

চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আমরা এযাবতকাল যৎসামান্য যা জেনেছি কিন্তু এর মূল্যায়ন বা বিচার করার অবকাশবোধ আমরা কেউই করিনি বলে ধরে নিতে পারি। যদিও বা যৎকিঞ্চিত চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণের বক্তব্যসমূহকে ভ্রান্ত বলে ধারণা করে আমরা প্রায়ই সমালোচনা করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ পরিমন্ডলে প্রবেশ করে নিখুঁতভাবে গবেষণা করে দেখার সুযোগ আমরা কেউই নিতে পারিনি। বলতে দ্বিধা নেই, এটাই আমাদের অক্ষমতা এবং অজ্ঞানতারই বহিঃপ্রকাশ।

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ইতিহাস ইত্যাদি সংরক্ষণ ও গবেষণা করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন করে এদেশের বিশিষ্ট উপজাতীয় শিক্ষাবিদ স্বর্গত অশোক কুমার দেওয়ানকে পরিচালক পদে নিয়োগ করে গবেষক ও ইতিহাস অনুরাগীদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এটা সকলেরই জানার কথা। কিন্তু ক'জনইবা এর সুযোগ করে নিতে পেরেছেন, তা আমাদের কাছে হাতের গণার মধ্যে। তন্মধ্যে স্বর্গত অশোক কুমার দেওয়ান এর নাম উল্লেখযোগ্য ও সর্বজনবিদিত।

স্বর্গত দেওয়ান চাকমা জাতির ইতিহাসের উপর মনোনিবেশ করে দেখতে পান যে, চাকমা জাতির অতীত ইতিহাস ঘোর তমসাবৃত। বিশেষ করে বিজাতীয় লেখকগণের সৃষ্ট ইতিহাসকে তিনি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেন এবং ১৯৮১ সালে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত "উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা–১ম সংখ্যায়" "চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক" নামে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে নূতন ধ্যান–ধারণার সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে তিনি "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন।

স্বর্গত অশোক কুমার দেওয়ান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনৃষ্টিটিউট এর পরিচালক পদ থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই উল্লেখিত পুস্তিকা রচনার কাজ প্রাথমিকভাবে সমাপ্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে পারিবারিক দায়িত্ববোধের পাশাপাশিতে থেকে পুস্তিকার সংযোজন, পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজ করে দ্বিতীয়বারের মত খসড়া পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে রাখেন। আমি ১৯৮৭ সনে খাগড়াছড়িতে একটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনৃষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পোষ্টিং হয়ে আসার পর

প্রায় সময় তাঁর কাছে যেতাম এবং পুস্তিকাটি প্রকাশের কথা স্মরণ করে দিতাম। কিন্তু অবশেষে তিনি আর পুস্তিকাটি প্রকাশ করে দেখে যেতে পারলেন না। আমি তাঁর একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং স্নেহভাজন হিসেবে তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপিগুলো (সংগ্রহ করে) প্রকাশ করার কথা তৎপুত্র চন্দন দেওয়ানকে অনুরোধ জানাই। আমি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তা ও গবেষণানুরাগী বিধায় মিঃ দেওয়ান সানন্দে পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দেন এবং প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মতি দেন। অতঃপর আমি পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আমারই শুভাকাঙ্খী ইনস্টিটিউটের তরুণ গবেষক মিঃ সুগত চাকমা (ননাধন দা)কে দিই। তিনি উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম অধ্যায়টির গাইড লাইন তৈরী করে পরবর্তী কাজ সমাধা করার জন্য আমার উপরই দায়িত্ব দেন (বিশেষ করে চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার–প্রথম অধ্যায় পুস্তিকাটি)। অতঃপর শ্রদ্ধেয় স্যারের পুত্রদ্বয় চন্দন ও ভাস্কর এবং ভ্রাতুস্পুত্র খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মিঃ সমীরণ দেওয়ান আমাকে উক্ত পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব দিলে, আমি স্বর্গত অশোক স্যারের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা রেখে তাঁর লেখা "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার"–প্রথম অধ্যায় পাণ্ডুলিপিটির অবিকল রচনার কাজ দীর্ঘ তিনমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমাপ্ত করি।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য প্রথম থেকেই অনেক আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। সর্বোপরি গ্রন্থ স্বত্তাধিকারীগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় পুস্তকটি প্রকাশের জন্য এগিয়ে আসেন শ্রদ্ধেয় স্যারের ভ্রাতুস্পুত্র বধূ আমার শ্রদ্ধাভাজন স্থানীয় সরকার পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মিঃ সমীরণ দেওয়ান এর সহ–ধর্মিনী মিসেস দিপীকা দেওয়ান। তিনি গভীর সহকারে আন্তরিকতার সহিত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পুস্তিকাটির প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করে পুস্তকটি প্রকাশ করে প্রয়াত লেখকের প্রতি অকুন্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে যে সৌভাগ্য অর্জন করলেন, মূলতঃ পুস্তিকার প্রকাশের কৃতিত্ব তারই। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ পুস্তিকার ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালকত্রয় জনাব জাফার আহাম্মদ হানাফী, মিস সাহানা দেওয়ান ও মিঃ সুগত চাকমা প্রমুখগণের মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করে আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন তা আমার ভুলবার নয়।

আমার শ্রদ্ধাভাজন মিঃ সমীরণ দেওয়ান, চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ,

খাগড়াছড়ি ও শ্রদ্ধেয় স্যারের পুত্রদ্বয় চন্দন দেওয়ান ও ভাস্কর দেওয়ান সর্বোপরি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তৈরী এবং প্রকাশের পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব দিয়ে আমাকে অসীম সাহসের পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে উক্ত কাজটি সমাধা করার জন্য যে উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্য আমি তাদের কাছে ঋণী।

সবশেষে তিলোত্তমা'র স্বত্বাধিকারী নিষ্ঠার সহিত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পুস্তিকার মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে সম্পর্ণ করতে পারাই তাদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

তাং ৩০শে নভেম্বর '১৯৯১ইং
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

(সুসময় চাকমা)
রিসার্চ অফিসার
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট
খাগড়াছড়ি

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ ৯

চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত কারগণ ঃ ১৪

ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব ঃ ১২

চাকমা জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ ১৭

ইতিহাসের সূত্র ঃ ১৯

সূত্রগুলির দুর্বলতা ঃ ২০

আরাকান কাহিনী দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং ঃ ২২

বামনীলিপি ও হাতে লিখা বিজক ঃ ২২

কাহিনী স্রষ্ঠা ব্রাহ্মণ পন্ডিত ঃ ২৪

ইতিহাসের অসংগতি ঃ ২৭

কুলগৌরব ও সভাকবির ভূমিকা ঃ ২৮

পৌরাণিক কাহিনী ঃ ২৯

ইতিহাসে পুরাণের প্রভাব ঃ ৩১

ইতিহাস বনাম পুরাণ কাহিনী ঃ ৩৩

বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান ও লোকগাথা

রাধামহ্ন–ধনপুদির রচনাকাল ঃ ৩৩

বিজয়গিরি আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক মূল্য ঃ ৩৮

রাজা সিরিত্তমা প্রসংগ ঃ ৪১

ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাস ও দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং ঃ ৪৯

পুগান রাজ আলংছিসুর বিরূদ্ধে চাকমাগণের যুদ্ধ ঃ ৫১

ব্রহ্মরাজ আলম প্রা'র বাঙ্গালী বিজয় ঃ ৫৪

মাতামুহুরী মোহনার যুদ্ধ ঃ ৫৫

রাজা ইয়াংজ বা অরুণ যুগ ও মইচাগিরির পতন ঃ ৫৬

চাকমা জাতির ইতিহাস ঃ ৬৩

চাকমা, চাক ও সাক পরিচয় ঃ ৬৫

বাংলার আরাকান সীমান্তে ঃ ৭৬

ইতিহাস সমীক্ষার ফলাফল ঃ ৭৯

পরিশিষ্ট–১ ঃ ৮২

পরিশিষ্ট–২ ঃ ৮৮

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পর্বত বেষ্টিত বিশাল আরণ্যভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা চাকমা জাতির বর্তমান মূল আবাসস্থল। ইংরেজ অধিকারের সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দিষ্ট ছিলনা। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলের সীমা নির্দিষ্ট করে তার নাম দেন Chittagong Hill Tracts। ইংরেজী ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা থেকে আলাদা করে এই জেলায় একটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সে সময় এ জেলার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদবী ছিল Superintendent of Hill Tracts[১]। ১৮৬৭ সালে এই কর্মকর্তার পদবী পরিবর্তন করে Deputy Commissioner of Hill Tracts করার পর থেকেই সরকারীভাবে এ জেলার নাম হয় Chittagong Hill Tracts-বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল অনেকটা No man's land হিসাবে পরিগণিত ছিল। পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রশক্তি কোন কালে এ অঞ্চলের উপর সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করেছিল বা করার চেষ্টা করেছিল ইতিহাসে তেমন কোন ইঙ্গিত নেই। তবে সম্ভবতঃ মায়নী উপত্যকা পর্যন্ত জেলার উত্তর প্রান্ত বরাবরই ত্রিপুরার প্রভাব বলয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। অনুরূপভাবে সর্ব দক্ষিণ প্রান্তও কোন কোন সময় আরাকানের অধীনে ছিল। কিন্তু মধ্যবর্তী বিশাল ভূ–ভাগের উপর কোন কালে এ দু'টি রাষ্ট্রশক্তি কোনটির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ মেলে না। বস্তুতঃ গভীর বনাকীর্ণ এই দুর্গম পার্বত্য ভূমি মোগল, পাঠান, ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি বিভিন্ন রাজশক্তির নিকট উপেক্ষিতই ছিল; তার উপর অধিকার বিস্তারের কোন প্রয়োজন বা আকর্ষণ কখনও অনুভূত হয়নি।

১· প্রথম Supdt. Capt. Megcreth. An Account of Bengaa. Vol. no. XXII, 1860. বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি প্রশাসনিক জেলায় ভাগ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই পুস্তকে বরাবরই সাবেক অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামকেই একটি জেলা হিসাবে ধরা হয়েছে।

আদিকালে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে কারও বাস ছিল বলেও মনে হয় না। সম্ভবতঃ শিকার জীবি কিছু আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠী মাঝে মাঝে পূর্ব দিক থেকে এসে হানা দিয়ে কিছুদিন বাদে আবার ফিরে যেত। এ অঞ্চলে বর্তমানে চাকমা সহ স্বকীয় বৈশিষ্ট মন্ডিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বাস। এ সব জনগোষ্ঠীর কোনটিরই কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নেই। চাকমা জাতির ক্ষেত্রেও প্রচলিত সুস্বীকৃত কিছু লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী ছাড়া এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ইতিহাস নেই। তাদের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য নির্ভর এবং প্রমান সিদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের এবং অধিকাংশই ইংরেজ আমলের কাগজ পত্রের সূত্র।

এ দেশে ইংরেজ অধিকারের কিছুকাল পূর্বে মোগল শাসনামলে শেষ যুগে এ অঞ্চলের কতিপয় চাকমা নরপতি বাণিজ্য সুবিধার্থে মোগল সরকারকে নামে মাত্র কিছু পরিমান কার্পাস বার্ষিক নজরানা (tribute) হিসাবে দিতেন, কিন্তু কার্যতঃ তারা স্বাধীন ছিলেন। তবে পার্বত্য অঞ্চলে সন্নিহিত সমতল ভূমিতে মোগল সরকারের অধীনে তাঁদের জমিদারী ছিল। কিন্তু সমতল এলাকার ওপারে পার্বত্য ভূ–ভাগের উপর মোগল সরকারের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা [২]। ইংরেজ সরকারও প্রথমদিকে এই এলাকাকে একটি স্বাধীন এলাকা হিসাবে বিবেচনা করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্বত্যবাসীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি। নবাব মীর কাশিমের সংগে ১৭৬০ সালে সম্পাদিত চুক্তিমূলে ইংরেজগণ বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের সঙ্গে চট্টগ্রাম জেলারও কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ চীফ Harry Verlest নবাবের প্রতিনিধি ইসলামাবাদের সুবাদার মুহম্মদ রেজা খানের নিকট থেকে চট্টগ্রামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই রাজার অধিকার সীমা ছিল "All the hills from the Pheni river to the Sangu and from Nizampur road to the hills of the kuki Raja. [৩]। সে সময়ের অল্প কিছুকাল পরেই

২· স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মোগল অধিকারভূক্ত Tippera (বর্তমান কুমিল্লা) জেলায় বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল।

৩· Nizampur road মোটামুটি বর্তমান ঢাকা চট্টগ্রাম রাস্তা। Tribes of the kuki Raja ছিল এককালীন Lushai Hill বর্তমানে Mizoram.

চাকমা রাজা সের দৌলত খাঁ ও পরবর্তী রাজা জান বক্স খাঁর সংগে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। জান বক্স খাঁ ছিলেন এ অঞ্চলের স্বাধীন চাকমা নরপতি। "Through Jan Box was recoded as a Zaminder, he maintaince his independence for many years." (H. S. Cotton, Memorandum History on the Revenue of Chittagong). সে ঘটনারও অনেক পরে ১৮২৯ সালে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার Mr. Halhead ইংরেজ সরকারকে লেখেন "I do not recognise any right "। কিন্তু স্বভাবতই শক্তিশালী প্রতিবেশী ইংরেজ সরকারের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁরা স্বাধীনতা হারাতে বাধ্য হয়-"The near neighbourhood, however, of a powerful and stable government naturally brought the chiefs by degrees under our influence."

ইংরেজ অধিকারের পর থেকে চাকমা জাতির ইতিহাসে তথ্যের আর কোন ঘাটতি নেই, কিন্তু তার পূর্ববর্তীকালের বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাসের অনেকাংশই কাল্পনিক এবং ভ্রমাত্মক। এ পর্যন্ত অনেকেই চাকমা জাতির ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করেছেন এবং ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে বিভিন্ন রচয়িতার বেশ কয়েকটি বই ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, চাকমা জাতির সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য একটি ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়াস আজ অবধি সফল হয়নি। এ অঞ্চলের প্রাথমিক যুগের ইংরেজ শাসকগণ গোড়া থেকেই একটি অমূলক ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, চাকমা জাতি আরাকান থেকে আগত তদ্দেশীয় একটি খন্ড জাতি, অবশ্য সে ধারণার মূলে বাহ্যতঃ কতগুলি কারণও ছিল। কালে কালে সেই ধারণা স্বজাতীয়গণের মধ্যেও গভীর বিশ্বাসের রূপ নেয়। সে ধারণার মূল এবং তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা কখনও করা হয়নি। প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে চাকমা জাতির ইতিহাস পুস্তক সমূহে বর্ণিত বিবরণগুলির যথার্থতা বিচার করার ও পরিবেশিত তথ্যগুলির প্রামান্যতা পরীক্ষা করার উদ্যোগ এ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। আমাদের মধ্যে এখনও প্রকৃত ইতিহাস চেতনার এবং ইতিহাসের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে। আমরা এখনও Mythology-কে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করি, জনশ্রুতিকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করি, পরীক্ষা ছাড়াই অপরের দেওয়া তত্ত্ব ও তথ্যকে নির্বিচারে মেনেই নিই। ফলে নানা ভ্রান্ত ধারণাকে আশ্রয় করে এবং জনশ্রুতিলব্ধ নানা কল্প কথাকে ভিত্তি করে রচিত কাহিনীগুলিই আজ

পর্যন্ত চাকমা জাতির ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনেকদিন থেকে সচেতন পাঠক শ্রেণীর মনে চাকমা জাতির প্রচলিত ইতিহাসের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আজকের দিনের অধিকতর শিক্ষিত এবং সচেতন জনগণের মনে এই প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় আরও গভীর হয়েছে যে কারণে এর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্র, আরও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। দুর্বল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনেক কাহিনীর সাথে কিছু কল্প কথার ভেজাল দেওয়া এই চকমপ্রদ ইতি কাহিনী কিন্তু আজকের দিনের সত্য সন্ধানী ইতিহাস সচেতন পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না। সাম্প্রতিক কালের সমীক্ষায় প্রচলিত ইতিহাসের অনেক অসংগতি ধরা পড়েছে এবং অনেক প্রচলিত ধারণা মিথ্যা বলে সপ্রমানিত হয়েছে। শতাব্দী লালিত সেই সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন অবশ্যই হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব

প্রাচীনকালে উপমহাদেশে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রটি ছিল একেবারেই শুণ্য। অতীতে এ দেশে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও পুরাণ কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস রচনায় হাত দেওয়া হয়নি। ইতিহাসবিদগণ বলেন, দ্বাদশ শতকে কাশ্মীরের ইতিবৃত্তকার কহ্লন রচিত "রাজতরঙ্গিণী"র পূর্বে উপমহাদেশে আর কোন প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থের সন্ধান মেলে না। মুসলিম ইতিবৃত্তকারগণের হাতেই প্রথম এদেশে ইতিহাস রচনার শুরু এবং ইংরেজ গণের হাতেই পূর্ণতর ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত হয়। এ কারণে উপমহাদেশে প্রাচীনকালের ইতিহাসের লিখিত উপাদান অত্যন্ত সীমিত। উপমহাদেশে সামগ্রিক ইতিহাস চর্চার এই শূন্যতার মধ্যে রাজতরঙ্গিণী একটি ব্যতিক্রম।

যাই হোক, উপমহাদেশের সুবিশাল ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র এবং প্রায় অকিঞ্চিৎকর একটি জাতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে উপাদানের স্বল্পতা স্বাভাবিক কারণে আরও তীব্রতর। ঐতিহাসিক উপাদানের এই স্বল্পতার কথা স্মরণ করে চাকমা জাতির অন্যতম ইতিবৃত্তকার স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত ক্ষেদের সংগে মন্তব্য করেছেন, "দুঃখের বিষয়, এই পার্বত্যগণের প্রতি প্রাচীন ইতিহাসে কোন সহানুভূতির পরিচয় নাই।"

এ পর্যন্ত যে ক'জন চাকমা জাতির ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ঐতিহাসিক উপাদান সমুহের স্বল্পতা এবং প্রামাণ্য তথ্যাবলীর অভাব তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। আন্তরিকতার তাঁদের অভাব ছিল না, প্রয়াসের কোন

কার্পণ্য ছিল না, কিন্তু ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও উপাদানের স্বল্পতার কারণে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনায় তাঁদের প্রয়াস অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। তবু এই দারুণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একেবারে শূন্য থেকে অন্ততঃ কিছু সৃষ্টি করতে পারার গৌরব এবং এভাবে ইতিহাসের মূল ভিত তৈরী করার কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য। প্রাচীনতর কালের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে উপাদান স্বল্পতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা আরও বেশী প্রকট। মাত্র খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য উপাদান এবং প্রামান্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সরকারী চিঠিপত্র, রিপোর্ট, মেমোরেন্ডাম ইত্যাদি দলিলপত্রের সূত্রে প্রাপ্ত এবং মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির ভিত্তি করে ঐসময়ের কিছুকাল পূর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চাকমা জাতির ইতিহাসের প্রামাণ্য চিত্র অংকন করা সম্ভব। পূর্ববর্তী মোগল শাসনামলের হস্তান্তরিত সরকারী কাগজপত্র থেকে আহরিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও ঐসব দলিল পত্রে স্থান পেয়েছে। তাই মোটামুটিভাবে মাত্র খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভিক কাল থেকেই চাকমা জাতির প্রামাণ্য এবং ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার অবকাশ আছে। তৎপূর্ববর্তীকালের ইতিহাস প্রধানতঃ জনশ্রুতি ও লোকবৃত্তের আলোকে গঠিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করার মত কোন সূত্র নেই।

এ স্থলে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কোন দেশের, কোন জাতির প্রাচীন ইতিহাসই পূরোপূরি একশভাগ প্রামাণ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের অনেক অংশ কমবেশী tentative বা অনুমান নির্ভর। অনেক সময় তথ্য ভিত্তিক না হলেও যুক্তি নির্ভর অনুমানও ইতিহাস নির্ণয়ে সহায়তা দান করে। অষ্টাদশ শতকের পূর্ববতী চাকমা জাতির জনশ্রুতিমূলক কাহিনীগুলি যে সর্বাংশে মিথ্যা সেরূপ মনে করার কারণ নেই। কিংবদন্তীর অনেক চরিত্রই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং অনেক ঘটনার মূলেও যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাতেও সন্দেহ নেই। তবে সমস্যা এই, সাল তারিখ উল্লেখ করে সে সব ব্যক্তি বা ঘটনার কাল নির্ণয় করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি নিঃসংশয়ে সেগুলিকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত সেগুলির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করাও দুস্কর। ইতিহাসের প্রাচীনতর অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর গবেষণা এবং গভীরতর সমীক্ষার প্রয়োজন। বর্তমান পর্যায়ে শুধুমাত্র যুক্তিসম্মত অনুমান প্রকাশ করা ছাড়া বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটি সর্বজন গ্রাহ্য ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ভবিষ্যত গবেষকগণই সেই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করবেন এবং জাতির পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হবেন এই আশা রেখে বর্তমান পুস্তকে কেবল

প্রাসঙ্গিক আলোচনাসহ অষ্টাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত চাকমা জাতির প্রচলিত ইতিহাসের বিভিন্ন অসংগতি এবং ভ্রান্তিগুলি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। বলে রাখা উচিৎ যে এই পুস্তকে গতানুগতিক ধারায় পূর্ববর্তী ইতিবৃত্তকারগণ প্রদত্ত বিবরণগুলির পুনরাবৃত্তি করে আরও একটি ছাঁচে ঢালা ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে যুক্তি নির্ভর আলোচনার মাধ্যমে এবং সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত কিছু নতুন তথ্যের আলোকে বিভিন্ন ইতিবৃত্তকারগণের পরিবেশিত তথ্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রচলিত ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিবৃত্তকারগণের কাজ ও কৃতিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও প্রয়োজনে তাদের তথ্য ও মতামতকে কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে খন্ডন করার প্রয়োজন হতে পারে-এ জন্য তীব্র কুণ্ঠা বোধ করি, কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের খাতিরে পীড়াদায়ক হলেও এ'ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণ

সর্ব প্রথম অন্যান্য বিষয়াদিসহ চাকমা জাতির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন এ জেলার প্রথম ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার Capt. T. H. Lewin তাঁর ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত "The Hill tracts of Chittagong and the dwellers therein." নামক গ্রন্থে। তাঁর আগে Lient. Phayre (পরে Sir Arthur Phayre), Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় ১৮৪১ সালে প্রকাশিত 'An account of Arakan' প্রবন্ধে চাকমাদের একটি শাখা আরাকান নিবাসী দৈংনাকদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন। চাকমা জাতির পরিচয় সহ এ জেলার নানা বিষয়ের উপর দ্বিতীয় পরিচয় R. H. S. Hutchinson -এর "An account of Chitagong Hill Tracts (1906). এই গ্রন্থে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কীত বিবিধ বিষয়ের উপর নানা বিবরণ দেওয়া হলেও ইতিহাস সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচিত হয়নি। স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষই তাঁর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত "চাকমা জাতি" গ্রন্থে সর্ব প্রথম সামগ্রিক পরিচয় সহ চাকমা জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। চাকমা জাতির ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি চাকমাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি নীতি, ভাষা, লিপি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে। বিবিধ তথ্যপূর্ণ এ প্রবন্ধটি দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করে। এই

উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি সরূপ "Royal Asiatic Society'র সদস্য পদ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে এবং বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রচন্ড চাপে চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রীতি নীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতিতে দ্রুত এবং বিপুল পরিমানে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত সতীশ চন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' এবং সেই সংগে শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রাকশিত Capt. Lewin এর "The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein" পুস্তক দু'টি তৎকালীন চাকমা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। এখানে উল্লেখ্য যে, সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর উপরোক্ত পুস্তকে চাকমা জাতি সম্পর্কীত নানা বিষয় অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বর্ণনা করা সত্ত্বেও তাঁর বইটি স্থানে স্থানে নিতান্ত ভ্রমাত্মক বিবরণে পূর্ণ। এ কারণে তিনি তৎকালীন চাকমা সমাজের অনেকেরই বিরাগভাজন হন। তাঁর পুস্তকে সন্নিবিষ্ট অনেক ভ্রমদুষ্ট তথ্য পরবর্তী ইতিবৃত্তকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেছে। কারণ চাকমাগণের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ যাদের নেই চাকমা জাতি সম্বন্ধে জানার জন্য এ পুস্তকটিই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। স্বভাবতই এই পুস্তকে পরিবেশিত ভুল তথ্যাদি অন্যদেরকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। সতীশ বাবু নিজেও লুইন সাহেবের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অনেক কিছুই সত্য মিথ্যা যাচাই না করে গ্রহণ করেন এবং নির্বিবাদে তাঁর বইয়ে চালিয়ে দেন। পরে আবার কেউ কেউ সতীশ বাবুর বই থেকে এগুলি ধার করেন। এভাবে অন্যদের মনে চাকমা জাতি সম্বন্ধে অনেক মারাত্মক ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। তা' সত্ত্বেও তাঁর এ পুস্তকের মাধ্যমে তৎকালীন চাকমা সমাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সতীশ চন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। একই সালে প্রকাশিত R. H. S. Hutchinson সম্পাদিত "Chittagong Hill Tracts District Gazettear, 1909" এ চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখা হয়। তবে এই বিষয়টির প্রতি গ্রন্থকারের মনযোগ অত্যন্ত শিথিল বলে মনে হয়। তথ্যাদি সংকলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়নি। যে কারণে অন্যান্য পুস্তকে পরিবেশিত এতদসংক্রান্ত তথ্যাদির সঙ্গে এ পুস্তকে উদ্ধৃত তথ্যাদির গুরুতর বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এর পরেই স্বজাতীয় লেখকগণ চাকমা জাতির ইতিহাস রচনায় হাত দেন। রাজা ভূবন মোহন রায় ১৯১৯ সালে তাঁর "চাকমা রাজবংশের ইতিহাস"

পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র; বিবরণাদি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; সেটিকে বংশ তালিকা ছাড়া ঠিক ইতিহাস পুস্তক বলা যায় না। অতঃপর মাধবচন্দ্র চাকমা কর্মী ১৯৪০ সালে তাঁর "শ্রীশ্রী রাজনামা" প্রকাশ করেন। চাকমা জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনার ব্যর্থতার জন্য তিনি তাঁর পুস্তকটিতে সতীশ চন্দ্র ঘোষের সমালোচনা করেন। পুস্তকের ভূমিকায় সতীশ চন্দ্র ঘোষের ইতিহাস আলোচনার ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লেখেন "আমরা বলিতে বাধ্য যে তাঁহার 'চাকমা জাতি' পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। তিনি আমাদের চাকমা জাতি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। তিনি উপযুক্ত উপাদানের অভাবে অপসিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অপ্রয়োজনীয় পুরান অংশ এবং জনশ্রুতিলব্ধ কিছু কাহিনী ছাড়া, (যেগুলি সতীশ ঘোষ তাঁর পুস্তকে স্থান দেননি) বাদবাকী মোটামুটি সব তথ্যের ব্যাপারেই তিনি সতীশ ঘোষকে অনুসরণ করেন এবং অভ্রান্ত মনে বার বার সতীশ ঘোষ প্রদত্ত তথ্যগুলিকেই সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেন। এর পরে নোয়ারাম চাকমার 'পার্বত্য রাজলহরী' ১৯৬২ সালে, বিরাজ মোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' ১৯৬৯ সালে, প্রাণহরি তালুকদারের 'চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস' ১৯৮১ সালে এবং সর্বশেষে শ্রীপূণ্যধন চাকমার 'চাকমা ইতিহাস' ১৯৮২ সালে ভারতের অরুণাচল থেকে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য সকলেই বর্তমানে লোকান্তরিত। তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় বিরাজ মোহন দেওয়ান বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা রাখেন। এ কাজের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস পরিষদের ফেলো মনোনীত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। উপরোক্ত লেখকগণ ছাড়াও কতিপয় স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় লেখক নানা পুস্তক ও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে চাকমা জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় দানের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁদের সব সূত্রই ছিল উপরোক্ত বইগুলি। উল্লেখ্য, সতীশ ঘোষের পরবর্তী সকল ইতিবৃত্তকার সতীশ ঘোষ পরিবেশিত ইতিহাস সংক্রান্ত প্রায় সমূদয় তথ্যই বিনা পরীক্ষায় প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রূঢ় হলেও মন্তব্য করতে হয় যে পরবর্তী লেখকগণের অধিকাংশ বিবরণ মূলতঃ সতীশ ঘোষেরই চর্বিত চর্বন। যেহেতু প্রকাশিত ইতিহাস পুস্তক সমূহের মধ্যে স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' পুস্তকটিতে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী প্রায় সমূদয় তথ্যই পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণের মূল ভিত্তি এবং তাঁর মতবাদই এ পর্যন্ত চাকমা জাতির প্রকৃত ইতিহাস হিসেবে এ যাবৎ বিবেচিত হয়ে এসেছে সেহেতু প্রচলিত ইতিহাসের অসংগতিগুলি নির্দেশ করার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তাঁর চাকমা জাতি'র বিবরণগুলিকেই আলোচনায় উপস্থাপিত করা হবে।

চাকমা জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আশঙ্কা হয় প্রচলিত চাকমা জাতির ইতিহাসে যাঁদের অন্ততঃ মোটামুটি অধিকার নেই তাঁদের পক্ষে এই পুস্তকে অন্তর্গত আলোচনা অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। তাই পাঠকদের পক্ষে আলোচনা অনুসরণের সুবিধার্থে এখানে প্রচলিত ইতিহাসে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজনঃ—সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু, যাঁর বংশধর মহাবীর ইক্ষাকু, সগর, ভগীরথ, রঘু, নবরূপী, নারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সূর্যবংশীয় নরপতিবৃন্দ। এই বংশ ধারা থেকে উদ্ভূত এক শাখা শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন শাক্য কুলসিংহ সিদ্ধার্থ বা গৌতমবুদ্ধ। শাক্যবংশের অপর এক শাখার 'শাক্য' নামীয় জনৈক রাজা হিমালয়ের পাদদেশে কলাপ নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। পরে চম্পককলি নামে জনৈক রাজা কলাপনগর থেকে তাঁর রাজধানী চম্পানগর বা চম্পকনগরে স্থানান্তরিত করেন। চাকমাগণের আদি রাজা বলে কথিত রাজা বিজয়গিরি এই চম্পক কলিরই উত্তর পুরুষ।

যুবরাজ থাকাকালেই বিজয়গিরি রাজ্য জয়মানসে তাঁর সেনাপতি রাধামোহনকে সংগে নিয়ে দক্ষিণাভিমূখে যাত্রা করেন এবং ক্রমে ক্রমে মঘদেশ, খ্যংদেশ, অক্সাদেশ, কাঞ্চননগর, কালঞ্জর প্রভৃতি দেশ জয় করার পর স্বরাজ্যে ফেরার কালে পথিমধ্যে শুনতে পান যে ইতোমধ্যে পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং রাজার অবর্তমানে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় প্রজাবৃন্দ কনিষ্ঠ রাজপুত্র সমরগিরিকে সিংহাসনে বসিয়েছে। তখন ক্ষোভে, দুঃখে বিজয়গিরি স্বরাজ্যে ফিরে না গিয়ে স্বসৈন্যে তাঁর বিজিত রাজ্য 'সাপ্রেই কুলে' প্রত্যাবর্তন করেন এবং নূতন এক চাকমা রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাই চাকমাগণের কীর্তিমান রাজা বলে কথিত সিরিত্তমা এই বংশের মনিজগিরি বা মানেকগিরি নামে এক রাজা পুরাতন রাজধানী থেকে উচ্চব্রহ্মে সরে গিয়ে নিজের নামানুসারে নূতন রাজধানী মাইচাগিরির পত্তন করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মদেশে রাজ্য বিস্তার করে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন এবং বাঙালীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তাঁদের প্রভাব আরও বাড়িয়ে তোলেন। ইতোমধ্যে আরাকান রাজও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠায় ক্ষমতা নিয়ে উভয় রাজার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ মেংদি উচ্চব্রহ্মের চাকমা রাজের বিরুদ্ধে বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং কূটকৌশলে চাকমা রাজ ইয়াংজকে পরাজিত করেন। আরাকান রাজ তাঁকে সহ তিন রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং আরও দশ হাজার প্রজাকে বন্দী করে সংগে নিয়ে আসেন। বন্দী প্রজাদের দৈংনাক আখ্যা

দিয়ে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজকুমারী চমি খাঁকে আরাকান রাজ নিজে বিয়ে করেন।

এভাবে উচ্চ ব্রহ্মের চাকমা রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর জ্যেষ্ঠ রাজ কুমার চজুং সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় উচ্চব্রহ্মে 'মং জাম্রু' নামে নূতন এক রাজধানীর পত্তন করেন। চজুং এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতস্পুত্র মংছুই বা মইসাং এর আমলে পুনরায় আরাকান রাজ মংজা ম্রু আক্রমন করে তাকে ধ্বংস করেন। ফলে মইসাং কালাদান নদীর তীরে 'চক্কোই ধাও' নামক স্থানে পালিয়ে আসেন, কিন্তু সেখানেও টিকতে না পেরে তিনি বা তাঁর ছেলে মারেক্যজ ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পালিয়ে আসেন এবং নবাবের কাছ থেকে সীমান্তের নিকট বার খানি গ্রামের অধিকার লাভ করে সেখানে হীনভাবে বাস করতে থাকেন। কালে কালে সেখানেও চাকমারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। রণ পাগালার নেতৃত্বে মঘরাজার সংগে চাকমাদের এক যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে মঘরাজা পরাজিত হন। রাজা তৈনসুরেশ্বরীর পুত্র জনু। আরাকান রাজ তাঁকে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তিনি মঘরাজাকে তাঁর কন্যা সাজাইয়ু বা সাজেবীকে সম্প্রদান করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জনুর নেতৃত্বে পেগু রাজার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় ব্যাংকক পর্যন্ত বিজিত হয়। জনুর সেনাপতি এবং জামাতা বুড়া বড়ুয়া। জনুর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র 'সাত্তুয়া' রাজা হন–যিনি পাগালা রাজা নামে খ্যাত। পাগালা রাজা রাণীর চক্রান্তে নিহত হন। রাজার পুত্র সন্তান না থাকায় প্রজাগণ মিলে তাঁর দৌহিত্র 'ধাবানা'কে রাজা করে। ধাবানার পরে ধরম্যা, ধরম্যার পরে মোগল্যা, মোগল্যার পরে সুভল খাঁ। প্রচলিত ইতিহাসে এর পরবর্তী রাজাই ইংরাজ শাসনামলের কাগজ পত্রে উল্লেখিত রাজা জালাল খাঁ মতান্তরে ফতে খাঁ যিনি ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের সংগে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই সময় থেকে পরবর্তী ইতিহাস আধুনিক কালের। এই হলো চাকমা জাতির প্রচলিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সমগ্র ইতিহাসকে মোট পাঁচটি ভাগে বা পর্বে ভাগ করা যেতে পারে।

১। পৌরণিক কাহিনী।

২। বিজয়গিরির লোক কাহিনী।

৩। ব্রহ্ম–আরাকান ইতিহাস সম্পৃক্ত তথাকথিত চাকমা ইতিহাস।

৪। আরাকান চট্টগ্রাম সীমান্তের জনশ্রুতি ভিত্তিক ইতি কাহিনী।

৫। আধুনিক কালের প্রমাণ সিদ্ধ ইতিহাস।

উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে একটির সংগে পরবর্তীটির সুষ্ঠ কালগত সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। সকল ইতিবৃত্তকারই সব অধ্যায়গুলির আলোচনা করেননি; বিভিন্ন জনের বিবরণেও প্রচুর অনৈক্য আছে। সতীশ চন্দ্র ঘোষ পৌরাণিক প্রসঙ্গটিকে তাঁর আলোচনায় মোটেই স্থান দেননি। তিনিই সর্বপ্রথম আরাকান কাহিনী 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' এর বরাত দিয়ে চাকমা জাতির ইতিহাসকে ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাসের সংগে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ সতীশ বাবুর এ সম্পর্কীত কাহিনীগুলি প্রায় অবিকৃতভাবে তাদের পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করে নির্বিবাদে সেসব কাহিনীকে চাকমা জাতির ইতিহাস হিসাবে কেবল স্বীকার করে নিয়েছেন তা নয় বরং নিজেদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগে কাহিনীগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরও জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু সতীশ ঘোষের দেওয়া বর্মী নামগুলিকে সংস্কার করে সেগুলিতে চাকমা গন্ধ দিয়ে চাকমা জাতির ইতিহাসের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সতীশ ঘোষ ষোড়শ/সপ্তদশ শতকের জনশ্রুতি ভিত্তিক ইতিহাস অধ্যায়টিও আলোচনা করেননি। পরবর্তী লেখকদের পুস্তকে এ সময়ের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া থাকলেও বিবরণগুলি অস্পষ্ট, বিভিন্ন গ্রন্থকারের প্রদত্ত বংশ পঞ্জিতে রাজন্যবৃন্দের নামে এবং কালপঞ্জিতে কোন মিল নেই, যার ফলে সেগুলিকে ভিত্তি করে চাকমা জাতির একটি Sober History বা যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস খাড়া করা কঠিন।

ইতিহাসের সূত্র

চাকমা জাতির ঐতিহাসিক পরিচয়ে ক্যাপ্টেন লুইনের সূত্র ছিল প্রচলিত জনশ্রুতি, সরকারী কিছু চিঠিপত্র, ব্রহ্ম রাজ ও আরাকান রাজের লিখিত দু'টি চিঠি এবং সর্বোপরি নিজের ব্যক্তিগত ধারণা। সতীশ বাবুর সূত্রও ছিল প্রধানতঃ জনশ্রুতি ও বিবিধ লোককাহিনী, লুইন কর্তৃক পূর্বে নির্দেশিত চিঠি দু'টি সহ আরো কিছু সরকারী কাগজপত্র, চাকমা রাজদপ্তরে রক্ষিত সন্দেহজনক কয়েকটি সীলমোহর, ব্রহ্মদেশের ইতিহাস বলে কথিত 'চুইজং ক্যথং' থেকে একটি উদ্ধৃতি ও আরাকান কাহিনী "দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং" নামে আরাকানী ভাষায় লিখিত একটি স্বল্প পরিচিত পুঁথি। শেষোক্ত পুঁথিতে বিবৃত কাহিনীই ছিল চাকমা জাতির আধুনিক পূর্বকালের ইতিহাস রচনার তার প্রধান ভিত্তি। পরবর্তী লেখক রাজা ভূবন মোহন রায় তাঁর "চাকমা রাজবংশের ইতিহাস" পুস্তিকার তথ্যাবলীর জন্য কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি। মাধব কর্মীর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সূত্র ছিল গ্রহাচার্য শঙ্করাচার্য নামে জনৈক ব্রাহ্মন পন্ডিত রচিত 'রাজনামা' নামক পুঁথির

হস্তলিখিত অনুলিপি। এই পুঁথির প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই আলোচনায় পরে আসছি। ইতিবৃত্তকারগণের সকলেই তাঁদের পূর্ববর্তী গ্রন্থকার, বিশেষতঃ সতীশ ঘোষের প্রদত্ত সূত্রগুলিই ব্যবহার করেছেন কিন্তু নূতন কোন সূত্রের সন্ধান দিতে পারেননি। স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার তাঁর "পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বামনীর লেখার বিজোগ" এর সূত্র উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেগুলি লিপিকারের নাম বা লিপিকাল ইত্যাদি উল্লেখ করেননি। লক্ষ্যনীয় যে, বিরাজ মোহন দেওয়ান ও প্রাণহরি তালুকদারের পুস্তক দু'টিতে রাজ বংশ তালিকা ও অন্যান্য বিবরণাদি প্রায় অভিন্ন। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উভয়েই একই পুঁথির সূত্র অবলম্বন করেন। বিরাজ মোহন দেওয়ানের পুস্তকের 'নিবেদন' ভূমিকায় অংশে উল্লেখ রয়েছে যে প্রাণহরি তালুকদার তাঁর স্বর্গতঃ পিতা কর্ণ তালুকদারের রক্ষিত "রাজ বংশাবলী" পুঁথির পাণ্ডুলিপি তাঁকে ব্যবহারের জন্য দেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান ও কোন নূতন সূত্রের অবলম্বন পাননি, পূর্বোল্লিখিত সূত্রগুলির সাহায্যে পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং "রাজ বংশাবলী" পুঁথিতে সন্নিবেশিত তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে তিনি বিবরণগুলিকে আরো বিশদ করার চেষ্টা করেন।

সূত্রগুলির দুর্বলতা

ইতিবৃত্তকারগণ যে সব সূত্রগুলি অবলম্বনে চাকমা জাতির ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করেছেন সেগুলি পরিমানে যেমন স্বল্প সূত্রগুলির ভিত্তিও তেমনি দুর্বল। যে সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্রের সাহায্যে সচরাচর একটি দেশের বা জাতির ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে, যেমন প্রত্নলিপি, মুদ্রা, স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতি ফলক, ভাস্কর্য, দেশী বিদেশীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কাব্যে ও সাহিত্যে বিধৃত তথ্য ইত্যাদি সহায়ক কোন সূত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ চাকমা জাতির ইতিহাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। জনশ্রুতিকেও ইতিহাসের একটি উপাদান হিসাবে ধরা যায় ঠিক, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেগুলি এককভাবে তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। সেগুলিকে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে ধরতে পারা যায় কেবল তখনই যখন সেগুলির সমর্থন অন্যান্য সূত্র থেকে যথেষ্ট প্রামাণ্য তথ্য হাজির করা সম্ভব হয়। চাকমা সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলির উৎপত্তিকাল এবং তাদের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেও ধারণা করা মুশকিল। রাজা বিজয়গিরির আখ্যায়িকার সংগে গ্রথিত করে ধনপুদি [৪]। রাধামহ্নের যে প্রেম কাহিনী চাকমা

৪· অনেক লেখকই ধনপুদি নামের বাংলা করেছেন ধনপতি। 'পতি' শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক বিধায় এ'টি স্ত্রীলোকের নামের সংগে যুক্ত হতে পারে না। শব্দটি অবশ্যই

সমাজে প্রচলিত আছে তাকে সতীশ ঘোষ থেকে শুরু করে সকল ইতিবৃত্তকারই ঐতিহাসিক মূল্য দিয়ে ঐ কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত পালাগান থেকে ইতিহাসের উপাদান খুঁজেছেন । কিন্তু এই পালাগীতের ভাষায়, পারিপার্শ্বিক বর্ণনার, চরিত্র চিত্রণে, ঘটনা বিন্যাসে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে এই পালা গীতটি নিতান্ত অর্বাচীন কালের রচনা বলে মনে হয় । অতএব পালা গীতে বিধৃত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ রয়েছে । মনে হয় কোন এক সময় বাঙ্গালী গায়েনদের অনুকরণে কোন এক বা একাধিক চাকমা কবি বা 'গেন্‌কুলি' রাজা বিজয়গিরির আখ্যায়িকার সংগে কাব্য কাহিনীর নায়ক সেনাপতি রাধামহ্‌ন এবং নায়িকা ধনপুদি ও তৎসহ আরও কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র সন্নিবেশিত করে একটি অনবদ্য প্রেমকাহিনী রচনা করেন যা বহু গেন্‌কুলি কর্তৃক বংশ পরম্পরায় গীত হ'তে হ'তে কালে কালে একটি ইতিহাস ধর্মী লোককাহিনীতে পরিণত হয় । 'রাধামহ্‌ন–ধনপুদি' অথবা একই কাহিনী ধারার স্বতন্ত্র অনুবৃত্তি 'চাদিগাং ছাড়া' পালা দু'টিকে অর্বাচীন কালের কোন এক বা একাধিক কবির নিছক কাব্যকৃতি হিসাবে ধরে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত । ইংরেজ আমলের যে সমস্ত চিঠিপত্রকে সূত্র হিসাবে ধরা হয়েছে সেগুলিকে সন্দেহ করার তেমন কারণ নেই তবে মূল চিঠিগুলি লুইন বা সতীশ ঘোষ ছাড়া অন্যান্যরা নিজে কেউ পরীক্ষা করেছেন বলে মনে হয় না । পরবর্তী লেখকেরা কেবল লুইন, সতীশ ঘোষের reference দেন । ক্যাপ্টেন লুইনের বইয়ে উদ্ধৃত ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার ফারসী ভাষায় লিখিত মূল চিঠিখানি পরবর্তীকালে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি । কাজেই মূল চিঠি থেকে ইংরেজী ভাষায় তার অনুবাদকর্ম কতখানি সঠিক হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখার আর কোন উপায় নেই । সতীশ ঘোষ কর্তৃক লুইন উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির বাংলা অনুবাদ ও যথাযথ হয়নি; চিঠির পুরো অংশও তিনি চাকমা জাতি'তে দেননি । ফলে চিঠির অংশ বিশেষ থেকে পুরো প্রসংগের (Context) ভিত্তিতে চিঠিটির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা তাঁর বইয়ের পাঠকদের

হবে 'বতী' এবং নামটি ধনবতী। আদ্য বর্ণে 'ব' যুক্ত বাংলা শব্দ চাকমা উচ্চারণে 'প' এ পরিণত হওয়ার উদাহরণ বিরল নয়। যথাঃ বোঝা> পঝা, বক বক করে> পক পগান, বুদ বুদ> পুত্‌ পুদি ইত্যাদি । বতী যুক্ত আরও অন্যান্য নাম চাকমা উচ্চারণে সর্বদাই 'পুদি' হয়। যেমন রঙ্গপুদি, নীলপুদি, নন্যাপুদি ইত্যাদি। রমাপতি, লক্ষীপতি ইত্যাদি পতিযুক্ত পূরুষ নাম চাকমাদের কখনও দেওয়া হয় না। কারণ অচিরেই সেগুলির উচ্চারণ রমাপুদি, লক্ষীপুদি ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে লিঙ্গ নির্দ্ধারনে বিভ্রাট সৃষ্টি করে।

পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এই একটি মাত্র চিঠিকেই অবলম্বন করে তিনি একটি অত্যন্ত মারাত্মক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ব্রহ্ম সম্রাটের উক্ত চিঠিতে উল্লেখিত "ছিরীত্তমা ছাক" একজন কীর্তিমান চাকমা রাজা। আশ্চর্য্যের বিষয় পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণও নির্দ্বিধায় সতীশ বাবুর সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। একটু পরীক্ষা করার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি, ক্ষীণতম সন্দেহও তাঁদের মনে জাগেনি। অথচ এই ধারণা একটি প্রকান্ড মিথ্যা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এই চিঠির প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যথাস্থানে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আরাকান কাহিনী 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং'

চাকমা জাতির ইতিহাস রচনায় সতীশ ঘোষের প্রধান সূত্র ছিল আরাকান কাহিনী দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং'। ইতিহাস পুস্তক হিসাবে পুঁথিটির গুরুত্ব এবং তাতে সন্নিবেশিত তথ্যগুলির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। Phayre, Harvey প্রভৃতি ব্রহ্ম-আরাকানের ইতিবৃত্তকারগণ প্রধানতঃ 'মহারাজা ওয়েং', 'রাজওয়েং' প্রভৃতি প্রাচীন পান্ডুলিপির উপর নির্ভর করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে Phayre-ই সর্ব প্রথম বিবিধ পান্ডুলিপি ও পুঁথি পত্র থেকে ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি দেঙ্গ্যাওয়াদির' কোন নামোল্লেখ করেননি। 'দেঙ্গ্যাওয়াদির' কাহিনীকার তুলনামূলকভাবে একেবারে আধুনিক কালের ঐতিহাসিক বিবরণে যে প্রকার অবাস্তব, আজগুবি কাহিনীর অবতারণা করেছেন তাতেই মনে হয় যে এই পুঁথিটি আমাদের দেশে গ্রাম্য কবিগণের রচিত বিবিধ পল্লীগাথার অনুরূপ নিম্নমানের একটি পুঁথিমাত্র। পরিতাপের বিষয়, চেষ্টা সত্ত্বেও এই পুঁথিটি আমরা আজও সংগ্রহ করতে পারিনি। পুঁথিটির সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পরবর্তী আলোচনায় উপস্থিত করা হবে।

বামনী লিপি ও হাতে লেখা বিজক

চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার তাঁর সংরক্ষিত বা সংগৃহীত 'বিজক' বা বামনী লেখার পান্ডুলিপিকে অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে দাবী করেছেন। কিন্তু এই পান্ডুলিপির রচনাকাল এবং

লিপিকাল মোটেই প্রাচীন হওয়া সম্ভব নয়। বামনী লেখা নামে যে ধরণের লিপির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেই লিপি আসলে বিশেষ ঢঙে কায়দা করে লেখা আধুনিক বাংলা লিপিই। কোষ্ঠীপত্র ইত্যাদিতে এ জাতীয় লেখার সাক্ষাৎ আজও মেলে। সেকালে লিপিকুশলীরা নানা ঢঙের লেখা ব্যবহার করতেন; দলিলপত্রে, পুঁথি ইত্যাদি রচনাকালে এ জাতীয় লেখার প্রচলন ছিল। বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস এবং প্রাচীন বাংলা লিপির সাথে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে হস্তলিখিত পুঁথি ৩০০ বছর এমন কি ২০০ বছর প্রাচীন হলেও সংশ্লিষ্ট ইতিবৃত্তকারগণের পক্ষে সেগুলি পাঠোদ্ধার করা সহজ সাধ্য হতো না। আগের দিনে বাংলা বর্ণগুলির আকার এবং লিপি পদ্ধতি এমন ছিল যে, বিশেষতঃ লিপি বিশারদ ছাড়া আজকালকার সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সেগুলির ঠিকমত পাঠোদ্ধার করা কঠিন। বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। সতীশ ঘোষের আলোচ্য গ্রন্থটিতে রাণী কালিন্দীর দস্তখতের একটি নমুনা আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তিনি নিজের নামটি লিখতেন 'কালিন্দি'। আসল ব্যাপারটি এই যে তৎকালে ল ও ন এর বাহ্যিক আকারে তেমন গুরুতর পার্থক্য ছিল না। এভাবে অন্যান্য বর্ণাদির ব্যাপারে যতি চিহ্নের ব্যবহার প্রভৃতি প্রাচীন আমলের লিখন রীতির এমন কতগুলি বৈশিষ্ট ছিল যার ফলে বর্তমান দিনের সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সে সব লেখার পাঠ দুরূহ। রাণী কালিন্দী মাত্র সেদিনের। তাঁর পূর্ববর্তী শাসনের হাতে লেখা পুঁথি আজকের দিনের সাধারণ পাঠকদের পক্ষে পাঠ করা দুঃসাধ্য।

স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার তাঁর পিতৃদেব হতে প্রাপ্ত যে পুঁথিটির প্রাচীনত্বের দাবী করেছেন একটি সহজ হিসাব কষলে সেটির মোটামুটি বয়স নির্ণয় করা যায়। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৮ সালে। পিতার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র হিসেবে তাঁর পিতার বয়স তখন খুব বেশী হলে ৩০ বছর। সুতরাং তাঁর পিতার জন্ম হয় ১৮৫৮ সালের দিকে। আরও ৩০ বছর আগে যদি তাঁর পিতামহের জন্ম হয় তবে তা হয় আনুমানিক ১৮২৮ সালে। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায় শুধু তাঁর পিতা কেন, পিতার পিতা, এমনকি তাঁরও পিতা যদি পুঁথিটি লিখে থাকেন বা কারও হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলেও সেটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সামনের দিকে ছাড়া পেছনের দিকে যাওয়ার মোটেই সম্ভাবনা নেই। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সে সব পুঁথির বয়স আসলে খুব বেশী পুরণো নয় সম্ভবতঃ একশ' বছরও নয়। মাধব কর্মীর উল্লেখকৃত গ্রহাচার্য শঙ্করাচার্য প্রণীত দু'একটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন কপি থাকা অসম্ভব নয়, তবে সে সব পুঁথির মূল কপিতে সিরিত্তমা প্রসঙ্গসহ ইয়াংজ প্রমুখ অন্যান্য ব্রহ্মদেশীয় রাজন্যবৃন্দের বিবরণ থাকার

বিষয় বিশ্বাস করা কঠিন। যদি থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেগুলি লিপিকার কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। কারণ পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে সতীশ চন্দ্র ঘোষই উপরোক্ত ব্রহ্ম আরাকানী রাজাগণ জাতিতে চাকমা ছিলেন এই বিশ্বাসের আদি প্রবক্তা। সতীশ চন্দ্র ঘোষের চাকমা জাতি প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত চাকমা সমাজে সে সংবাদ অজ্ঞাত ছিল। অতএব, যে সব পাণ্ডুলিপি সিরিত্তমা, ইয়াংজ প্রভৃতি কাহিনী সহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক তথ্যাদিতে ঠাসা সে সব পাণ্ডুলিপি প্রাচীন হতে পারে না–সেগুলি মাত্র ১৯০৯ সালে 'চাকমা জাতি' প্রকাশিত হওয়ার পরই রচিত বা অনুলিখিত হওয়াই সম্ভব। আরও একটি প্রশ্ন এই তথাকথিত প্রাচীন পুঁথিগুলি চাকমা লিপিতে না হয়ে বামনী লেখা নামে বাংলা লিপিতে কেন ? চাকমাদের মধ্যে বাংলা লিপির চর্চা শুরু হয়েছে বেশী দিনের কথা নয়। একশ বছর আগেও সাধারণ চাকমাদের মধ্যে শুনামাত্র নিজস্ব লিপিরই চর্চা ছিল। সুতরাং উপরোক্ত পুঁথিগুলি নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে লিপিকুশলী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণকে দিয়ে লেখা, যে কারণে সেই লেখন রীতির নামই হয়েছে বামনী লিপি। স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার সে জাতীয় লেখাকে ভুল করে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি মনে করেছিলেন যা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এদেশে প্রচলন ছিল। (তাঁর পুস্তকের ৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সে কারণেও সম্ভবতঃ তার পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

কাহিনী স্রষ্ঠা ব্রাহ্মণ পন্ডিত

স্বর্গত মাধব চন্দ্র চাকমা তাঁর "শ্রী শ্রী রাজনামা'র ভূমিকায় লিখেছেন,–"রাজা জব্বর খাঁর রাজত্বকালে গ্রহাচার্য শঙ্করাচার্য নামে একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিত রাজকীয় পুরাতন পুঁথিপত্র অবলম্বনে সংক্ষেপে 'রাজনামা' রচনা করেন। উক্ত রচিত গ্রন্থ হইতে কেহ কেহ নকল করিয়া লইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থ তৎকালীন প্রচলিত বামনী (প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে) অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিখানি বাঁশের চুঙাতে সযত্নে রক্ষিত হইলেও কোনও কালে তাহা হারান গিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার অনুলিপি মাত্র"। মাধব বাবু 'আরও ২/১টি হস্তলিখিত রাজা নামা'র উল্লেখ করেছেন কিন্তু সে সব পুঁথিগুলির কোনটিই আমাদের হাতে আসেনি। পুঁথিগুলির লিপিকারের নাম বা লিপিকাল জানান হয়নি। তাঁর পুস্তক পাঠে মনে হয় তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য হস্তলিখিত 'রাজনামা'র কপিগুলি রাজবংশ পঞ্জীতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূলতঃ একই পুঁথিরই বিভিন্ন অনুলিপি। রাজা ভূবন মোহন রায়ের "রাজ বংশের ইতিহাস," বিরাজ মোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত', প্রাণহরি তালুকদারের "চাকমা রাজবংশের

ইতিহাস” প্রভৃতি পুস্তক গুলির বিবরণেও মোটামুটি একই ধারার পুনরাবৃত্তি। এ কারণে ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, পূর্বোক্ত গ্রহাচার্য শঙ্করাচার্য নামক ব্রাহ্মন পন্ডিতই রাজা জব্বর খাঁর রাজত্বকালে (১৮০১-১৮১২) তাঁরই আদেশে বা পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রাজনামা’ নামে একটি পুঁথি রচনা করেন এবং পরবর্তী কালে মূল পুঁথিটির অনুলিপি প্রস্তুতকালে বিভিন্ন অনুলেখকগণ আধুনিকতর তথ্যগুলি সদৃস্বছায় সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে একটি অভিনব ইতিহাস পুস্তিকা প্রস্তুত করেন; সেসব পুঁথিগুলিই পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণের মূল সূত্র হিসেবে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, R. H. S. Hutchinson সম্পাদিত Gazetter এ চাকমা জাতির ইতিহাস আলোচনা শুরু করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "The assistance of Brahmans has been invoked and the following history compiled ...." ইতিহাস রচনায় ব্রাহ্মণগণের ভূমিকার বিষয়টি নিশ্চয়ই তাঁর কানেও গিয়েছিল। অতএব মাধব কর্মীর উক্তি যদি সঠিক হয় তবে চাকমা জাতির ইতিহাস নামক বহুল প্রচলিত কাহিনীর আদি কাহিনীকার সে গ্রহাচার্য শঙ্কারাচার্য তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ রাজাদেশে তিনি কিছু পুরাণ কাহিনী, কিছু প্রচলিত জনশ্রুতি, কিছু স্বকপোল কল্পিত কাহিনী জুড়ে দিয়ে একটি ফরমায়েসী ইতিহাস প্রস্তুত করেছিলেন। সেই পুঁথিটির অনুলিপি প্রস্তুতকালে লিপিকারগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিকতর তথ্যগুলিসহ আরও কিছু কাহিনী যোগ করে বর্তমানে প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি করেন। রাজা বিজয়গিরির পূর্ববর্তী আমলের চাকমা জাতির পুরাণাশ্রয়ী ইতিকাহিনী সম্ভবতঃ গ্রহাচার্যের সৃষ্টি, তবে বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মদেশীর ইতিহাসের অংশটি গ্রহাচার্যের মূল পুঁথিতে থাকা অসম্ভব। সতীশ চন্দ্র ঘোষ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ পন্ডিত রচিত এই “রাজনামা” পুঁথির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। সে কারণে পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণের পুস্তকাদিতে প্রদত্ত পুরাণ কাহিনী এবং চাকমা রাজাগণের নাম সর্বস্ব বংশ তালিকা ও তাঁর পুস্তকে স্থান পায়নি। সেই পুঁথিটি যদি তিনি সূত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন তবে তিনি অবশ্যই তাঁর পুস্তকে সে কথার উল্লেখ করতেন-দেঙ্গ্যাওয়াদির সূত্রের উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না অথবা ছিরিস্তমার পরিচয় দানের ক্ষেত্রে লুইন প্রকাশিত চিঠিটির ভিত্তি গ্রহণ করতে হতো না। কারণ সেক্ষেত্রে মূল রাজনামার সূত্র অন্য দু'টি সূত্র অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অধিকতর প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হতো। সতীশ ঘোষ তাঁর পুস্তকের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ আট বৎসর কালব্যাপী পুস্তক রচনা কালে তিনি চাকমা জাতির শিক্ষিত এবং অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সংগে, বিশেষতঃ রাজা ভূবন মোহন রায়ের সংগে সর্বদাই সে বিষয়ে পরামর্শ এবং

মতবিনিময় করতেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই পুঁথিটির অস্তিত্ব বিষয়ে জানতেন না সে কারণে কেউ সতীশ ঘোষকে এই পুঁথিটির সন্ধান দিতে পারেননি। সতীশ ঘোষের পরবর্তী চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকার রাজা ভূবণ মোহন রায়। তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকার তথ্যের জন্য কোন সূত্রের উল্লেখ না করলেও মনে হয় তিনি সতীশ ঘোষের 'চাকমা জাতি' প্রকাশিত হওয়ার পর উক্ত 'রাজনামার' একটি কপি হস্তগত করেছিলেন। ইতিবৃত্তকারগণের মধ্যে তিনিই প্রথম চাকমা জাতির ইতিহাসে পুরাণ অংশটি জুড়ে দেন এবং কদম থংজা, তৈন সুরেশ্বরী, রন পাগালা প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ এবং রাজ পুরুষগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সে সব তথ্যগুলির সূত্র ছিল সম্ভবতঃ গ্রহাচার্যেরই উক্ত পুঁথি।

ভূবণমোহন রায় নিজেও সতীশ ঘোষ প্রদত্ত তথ্যগুলি জানতেন। তিনিও সম্ভবতঃ সতীশ ঘোষের ন্যায় উক্ত কাহিনী গুলিকে চাকমা জাতির কাহিনী হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, যে কারণে তিনি ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসের ইয়াংজ, চজুং প্রভৃতি বর্মী নামগুলিকে স্পষ্টতই চাকমাকরণের উদ্দেশ্যে অরুণ যুগ সূর্যজিৎ প্রভৃতি নামে পরিণত করে সেই অধ্যায়টি তাঁর ইতিহাস পুস্তিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন। সিরিত্তমা নামটিও সম্ভবতঃ তিনি একই উদ্দেশ্যে সংস্কার করে 'সেরমত্যা' নাম দিয়ে চাকমাকরণের প্রয়াসী হন। তিনি অবশ্য ইতিহাসে সেরমত্যা নামীয় রাজার স্থান নির্দিষ্ট করেন। অনেক পরবর্তী এককালে, তবে ঠিকই অরুণযুগের পূর্বে তার পিতা হিসাবে। যাই হোক, পুনরুক্তি করে আবার বলতে হয় যে, আমাদের স্থির বিশ্বাস সিরিত্তমা কাহিনী এবং 'দেঙ্গ্যাওয়াদি' থেকে সংকলিত ব্রহ্ম আরাকান কাহিনীর অংশগুলি মূল 'রাজনামায়' বা তদ্‌জাতীয় পুঁথিতে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। চাকমা ইতিহাসের অংশ হিসাবে এগুলি সতীশ চন্দ্র ঘোষই প্রথম যুক্ত করেন এবং পরবর্তী লেখকগণ সেগুলিকে তাঁদের বইতে স্থান দেন। সে কারণে পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণ যাদের তথ্যের জন্য প্রাচীন পুঁথি বা বিজক যেই সূত্রেরই দাবী করুন না কেন সে অংশ দু'টির বিবরণ দানকালে বরাবরই দেঙ্গ্যাওয়াদি অথবা সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির সূত্রই উল্লেখ করেছেন–বিজক বা রাজনামার নয়। সে সব তথ্যের জন্য ইতিবৃত্তকারগণ যদি 'রাজনামা' বা অনুরূপ পুঁথিকে মূল সূত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন তবে দেঙ্গ্যাওয়াদি সূত্রের উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিলনা অথবা সিরিত্তমার পরিচয় দানের ক্ষেত্রে লুইন প্রকাশিত ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার চিঠিটির ভিত্তি গ্রহণ করতে হতো না। কারণ সেক্ষেত্রে 'রাজনামা'র মূল সূত্রটি অপর দু'টি সূত্র অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অধিকতর প্রামাণ্য বলে গণ্য হতো। দেঙ্গ্যাওয়াদি বা ব্রহ্ম সম্রাটের

চিঠির বিবরণকে সেক্ষেত্রে প্রামাণ্যতার অতিরিক্ত সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করলেই যথেষ্ট ছিল।

পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী সূত্র ধরে পূর্ব পরিবেশিত তথ্যাদিই পুনরায় সালঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। সে সব সূত্রের প্রামাণ্যতা বা তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেননি, বরং নিজের মনগড়া ধারণাজাত আরো কিছু মনগড়া তথ্য তাতে যোগ করেছেন। একজন যদি শাক্যকুলের বংশ গৌরব দাবী করেন, অন্যজন তাতে সূর্য বংশকে জুড়ে দেন; একজন যদি রাজবংশ তালিকায় চতুর্দশ পুরুষের নামোল্লেখ করেন অপরজন সপ্তদশ পুরুষের তালিকা প্রকাশ করেন, একজন যদি ইয়াংজ, চজুং প্রভৃতিকে চাকমা রাজা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন অন্যজন সে নামগুলিকে সংস্কার করে অরুণ যুগ, শত্রুজিৎ ইত্যাদি বানিয়ে ফেলেন; একজন যদি কোন ঘটনার উল্লেখ মাত্র করেন অন্যজন ঘটনার সন তারিখ সহ তার সরস আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত রচনা করে ফেলেন, কেউ যদি অজ্ঞাত পরিচয় কোন মোগল কন্যার আভাস মাত্র দেন পরবর্তীজন তাঁর পিতৃ পরিচয়টিও দিয়ে ফেলেন। এভাবে ইতিহাস গ্রন্থের কলেবর মোটা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে আবর্জনা যতখানি জমেছে আসল বস্তু তত জমেনি।

ইতিহাসের অসঙ্গতি

বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকে প্রদত্ত চাকমা রাজাগণের বংশ তালিকা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরস্পরের মধ্যে এত অনৈক্য, এত অসঙ্গতি চোখে পড়ে যে একটি সুশৃঙ্খল ইতিকাহিনীর রূপ কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌরাণিক অংশ বাদ দিলে রাজা বিজয়গিরি থেকেই মূল কাহিনীর শুরু। কাহিনীতে রাধামহন তাঁর সেনাপতি। সতীশ চন্দ্র ঘোষ বিজয়গিরির কাল ধরেছেন 'চতুর্থ কি পঞ্চম' শতক, বিরাজ মোহন দেওয়ান ধরেছেন ৬ষ্ঠ শতক, ভূবন মোহন রায় ধরেছেন চর্তুদশ শতক। ভূবন মোহন রায়ের পুস্তকে 'সেরমত্যা' ছিলেন অরুণযুগের পিতা অথচ অন্যান্যদের বিবরণীতে সেরমত্যার নাম পাই অরুণ যুগের বহু পুরুষ এবং বহু শতাব্দী পরে। তথ্যাদির বিচারে যতদুর মনে হয় ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার পত্রে উল্লেখিত সিরিত্তমা ছিলেন সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের একজন আরাকানী রাজা, অথচ তাঁকে চাকমা রাজার রাজতিলক পরিয়ে পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের একজন চাকমা রাজা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে ইয়াংজ ছিলেন সম্ভবতঃ সান জাতীয় একজন ব্রহ্মদেশীয় রাজা, তাঁকেও

অরুণযুগ নাম পাল্টিয়ে চাকমা রাজা অরুণযুগের পোষাক পরানো হয়েছে। রুশ সাহিত্যিক আলেকসান্ডার বেলায়েভের একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রয়েছে Amphibian man বা উভচর মানুষ। কোন বৈজ্ঞানিক প্রাণী দেহে অংগ সংযোজনের এমন এক সফল পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে তিনি অদ্ভুত আকৃতির নানা জীবজন্তু তৈরী করতেন। কল্পকথার নায়ক মানুষের দেহে হাঙরের ফুসফুস যুক্ত এমনি এক জীব জলে স্থলে যার অবাধ বিচরণ। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে অঙ্গ খসিয়ে সেগুলোকে অন্য প্রাণীর দেহে সংযোজিত করে যেভাবে তিনি নানা বিদ্‌ঘুটে আকৃতির জীব সৃষ্টি করতেন সেভাবে আমাদের ইতিবৃত্তকারগণও প্রকৃত ইতিহাসের সংগে হিন্দু পুরাণ, ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাস প্রভৃতি জুড়ে দিয়ে 'চাকমা জাতির ইতিহাস' রূপ এমন একটি কিম্ভূত কিমাকার কাহিনী সৃষ্টি করেছেন যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। তাই দেখা যায়, ইতিহাসে ফাঁক আছে, অসংগতি আছে, কালাক্রমিকতার ত্রুটি আছে, প্রামাণ্যতার অভাব আছে। ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ।

কুল গৌরব ও সভাকবির ভূমিকা

'রাজনামা' প্রণেতা গ্রহাচার্য শংকরাচার্যের সঠিক পরিচয় জানা এখন আর সম্ভব নয়। যিনিই হোন তিনি ছিলেন একজন আচার্য ব্রাহ্মণ। জব্বর খাঁও ছিলেন একজন কালীভক্ত হিন্দুভাবাপন্ন রাজা। তাঁর ব্যবহৃত সীলমোহরে 'জয়কালী জয়নারায়ণ জব্বর খাঁ' খোদিত কথাগুলিতে তাঁর হিন্দু ধর্ম প্রীতি প্রতিফলিত। কেবল নামটি ছাড়া বিশ্বাসে, সংস্কারে, আচারে তিনি ছিলেন পুরোপুরি হিন্দু। সুতরাং উক্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সহায়তায় চাকমা রাজন্যবৃন্দের বংশ গৌরব প্রতষ্ঠা কল্পে তিনি যে হিন্দু পুরাণোক্ত চন্দ্র বংশ বা সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয়কুল তথা শাক্যকুল গৌরবের অংশীদারত্ব দাবী করবেন তাতে আর আশ্চার্য হওয়ার কী আছে ? আগেকার দিনে রাজাগণ সভাকবি রেখে নিজের প্রশস্তি রচনার ব্যবস্থা করতেন। বর্তমান দিনেও যে এই প্রথা একেবারে রহিত রয়েছে তা'নয়, অন্যভাবে এ প্রথা আজও প্রচলিত। আজকাল আর ঠিক আগেকার মত রাজা নেই সত্য কিন্তু তাঁর স্থলে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান রয়েছেন। দেশী বিদেশী প্রেস বা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নানাভাবে পরিতুষ্ট, প্রভাবিত বা বশীভূত করে নিজের কীর্তি কথা প্রচার অথবা কলঙ্ক চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা যে হরহামেশাই হচ্ছে একথা কে না জানে ? অতএব চাকমা রাজা জব্বর খাঁ নিজ বংশ গৌরব, প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচুর পারিতোষিকের বিনিময়ে গ্রহাচার্য শংকরাচার্যকে দিয়ে হিন্দু পুরাণোক্তি চন্দ্র বংশ

বা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের দাবী নিয়ে যে উক্ত 'রাজনামা' নামক ফরমায়েসী ইতিহাস পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছিলেন সে কথা অনুমান করা কঠিন নয়।

মাধব বাবুর পুস্তকের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ আছে যে, 'রাজকীয় পুরাতন পুঁথিপত্র অবলম্বনে' গ্রহাচার্য কর্তৃক উক্ত 'রাজনামা' পুঁথিটি প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ভেবে দেখা উচিত যে সুদুর রোয়াং থেকে এ অঞ্চলে আগমনের পর নানা উত্থান পতন, রাজনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয়ের পর কী পরিমান প্রাচীন পুঁথিপত্র চাকমা রাজ দপ্তরে থাকা সম্ভব ? যাই হোক, এবার প্রচলিত ইতিহাসের প্রথম পর্ব থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

পৌরাণিক কাহিনী

ইতিবৃত্তে চাকমাদের শাক্য বংশোদ্ভুত বলে দাবী করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার এই বংশধারা সূচনা একেবারেই সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু থেকে দেখানোই গৌরব মনে করেন। সূর্যবংশের বংশ তালিকা পুরাণ ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে; যদিও নাকি বিভিন্ন পুরাণে বংশ পঞ্জির মধ্যে প্রচুর হেরফের দেখা যায়। চাকমা জাতি'র ইতিবৃত্তকারগণের মধ্যে কয়েকজন বেশ সবিস্তারে এই বংশ তালিকার বিবরণ দিয়েছেন। মন্তব্য নিস্প্রয়োজন যে এ কাহিনী নিতান্তই পুরান কাহিনী, এর সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই, এ কারণে বিরোধও নেই। তবু কেন অনেকের পুরাণ কাহিনীর প্রতি এত আসক্তি ?

নিজেকে এবং নিজের অতীতকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষের ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত এবং এই আকাঙ্খার কারণেই পুরাণ কাহিনীর প্রতি তার এত অনুরুক্তি। মানুষের স্মৃতি ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বড়জোর পাঁচপুরুষ, দশপুরুষ, কি চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত সঠিকভাবে নিজের অতীতকে সে স্মরণ করতে পারে। কিন্তু পেছনে যেতে যেতে সে যখন অন্ধকার বিস্মৃতির জগতে হারিয়ে যায় তখনই মানুষ কল্পনা করে সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনীর। অতীতকে জানার এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই জন্ম দিয়েছে কত অবিশ্বাস্য অলৌকিক কল্পকথার, কত কিংবদন্তী, পুরাণকাহিনী কত সৃষ্টিতত্ত্বের। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি জাতির মধ্যেই নিজস্ব একটি সৃষ্টি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। আজকের দিনের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এসব কাহিনী নিতান্ত হাস্যকর মনে হতে পারে কিন্তু এককালের সহজ, সরল মানুষ অন্তর দিয়ে এগুলিকে বিশ্বাস করতো। আজকের দিনেও এগুলির মূল্য কমেনি, আগের মতই এ কাহিনীগুলি আমাদের আনন্দ দেয়; রহস্যভরা অতীতের প্রতি অন্তরে একটি সশ্রদ্ধ অনুভূতি সঞ্চার করে

এবং পরোক্ষভাবে আমাদের কাছে মানুষের মহৎ কল্পনাশক্তি এবং সৃষ্টিশীলতার গৌরব প্রতিভাত করে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই ধরা যাক্।

জগতের আদিতে নিঃসীম অন্ধকারে আবরিত অগাধ জলধির বুকে আকারহীন, শব্দহীন স্পন্দনহীন অপার শুন্যতার মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন ঈশ্বর আদেশ করলেন "Let there be light" এবং এক লহমায় সৃষ্টি হলো আলো, সৃষ্টি হলো দিন ও রাত্রির। তারপর ক্রমে ক্রমে ছয়দিনের সঙ্কীর্ণ সময় সীমার মধ্যে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আকাশ আর পৃথিবী, চন্দ্র আর সূর্য, গাছপালা, পশুপাখী এক কথায় দুনিয়ার তাব্যবস্তু এবং তাব্য প্রাণী। স্বর্গোদ্যানে একটি মাটির ঢেলায় ফুঁ দিয়ে তাতে জীবন সঞ্চার করে সৃষ্টি করলেন বিশ্বের আদি মানব আদমকে। এর পর আদমের পাঁজড়ার হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন ঈভ বা হাওয়া বিবিকে। Then the man said, "At last here is one of my own kind. Bone taken from my bone, and flesh from my flesh. Women is her name because she was taken out of man."-এর পরই স্বর্গোদ্যান থেকে মানুষের পতনের কাহিনী এবং অপরাপর ঘটনাবলী। তিনশ' বছর আগেও এই অলৌকিক সৃষ্টি কাহিনী প্রতিটি খৃষ্টান অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতেন। এক সময় পন্ডিতেরা ধর্ম শাস্ত্র ঘেঁটে বিশ্বসৃষ্টির তারিখটি, এমনকি সময়টি পর্যন্ত অঙ্ক কষে নিখুঁতভাবে বের করেছিলেন–সেটা ছিল কিনা ৪০০৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দের অক্টোবর মাসের ২৩ তারিখের সকাল বেলা ঠিক নয়টার সময়।

এই চমৎকার চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি কাহিনী আজকের দিনের মানুষের যুক্তিকে আর আগের ন্যায় তেমন ভাবে আচ্ছন্ন করে না বটে কিন্তু কাহিনীর মর্ম এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে হৃদয়কে এক অপার্থিব অনুভবে ভরিয়ে তোলে। "............much of their detail is no longer regarded as strictly factual. Instead, they are more properly interpreted as mystiries he could not possibly understand, his fear of the unknown and his often poetic attempts to constituet a kind of theological prehistory to satisfy his desire for a good and moral world" (F. clark Howell; Earlyman) বাইবেলের এই সৃষ্টি কাহিনী

সম্বন্ধে আজকের দিনে খৃষ্টানদের ধারণা বদলেছে, কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে আগেকার বিশ্বাস লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর ও বাইবেলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা একটুও ক্ষুন্ন হয়নি । Clark Howell এর ভাষায়-"Its simple sweeping concepts are interpreted by most modern christians and jews as being symbolic of the spirit and mayesty of God."

ইতিহাসে পুরাণের প্রভাব

ভারতের রাজ বংশগুলির আদি পুরুষকে হিন্দু পুরাণ কাহিনীর কোন না কোন চরিত্র থেকে উদ্ভুত বলে কল্পনা করা হয়েছে । পূর্ব ভারতের ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ভারতের বাহির থেকে এসেছিল একথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু কালক্রমে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে যখন তাদের প্রাচীনতর ভাষা, ধর্ম এবং অপরাপর বিশ্বাস প্রচন্ডভাবে নাড়া খেয়ে অবলুপ্ত হয় বা হতে বসে তখন এদেশের ঐতিহ্যানুযায়ী তাদের পূর্বের ইতি কাহিনীগুলিকে কোন না কোন ভাবে হিন্দুপুরান কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের জীইয়ে রাখার চেষ্ঠা করা হয় অথবা পুরাণ কাহিনীর ছকে ফেলে তাদের এক নতুন রূপ দান করা হয় । তা আমরা দেখতে পাই নেপালের রাজবংশকে প্রথম দিকে সোমবংশ পরে সূর্য বংশীয় লিচ্ছবী গোত্র থেকে উদ্ভুত বলে দাবী করা হয় । প্রাচীন কামরূপের রাজারা চন্দ্রবংশীয়, অহোম রাজারা ইন্দ্র বংশীয়, ত্রিপুরার রাজারা চন্দ্র বংশীয়, কাছারী রাজাগণ ভীম ও হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলে দাবী করতেন । মাইথি বা মণিপুরীদের পুরাণ কাহিনী "মনিপুর পুরানে" নিজেদের পঞ্চপান্ডবের অন্যতম পান্ডব অর্জুনের বংশধর বলে দাবী করা হয়েছে। উপমহাদেশের বাইরেও যেখানেই ভারতীয় সংস্কৃতি শেকড় গেড়েছে সেখানেও একই অনুকৃতি লক্ষ্য করি। বালি, যবদ্বীপ, প্রাচীন চম্পা, ফুনান, কাম্বোজ সর্বত্রই একই দশা। কাম্বোজের (Cambodia) প্রাচীন রাজবংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজ ২য় জয়বর্মনের সাফল্যের মূলে ছিল যবদ্বীপ থেকে আমদানী করা Deveraja cult, হিন্দু পুরাণের এই ছত্রছায়া ছিল তার পরবর্তী জীবনের দুর্জয় শক্তির আধার।

ব্রহ্মদেশের পুরাকাহিনী 'মহারাজা ওয়েং' এ ব্রহ্মবাসীদের ভারতীয় শাক্য বংশোদ্ভুত বলে দাবী করা হয়েছে । এই কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে গৌতম বুদ্ধের জন্মেরও বহু পূর্বে কপিলাবস্তু নগরের শাক্যবংশীয় "অভিরাজ" নামীয়

জনৈক রাজা এক সময় নিজ রাজ্য ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর তীরে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন–যা বর্তমানে তগৌ নামে পরিচিত। তাঁর দুই ছেলে কান–রাজগি্য আর কান–রাজঙ্গি। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিবাদের ফলশ্রুতিতে কর্ণিষ্ঠ রাজপুত্রের কাছে চাতুরীতে হেরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র কান–রাজগি্য দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে ক্রমে ক্রমে আরাকানে এসে হাজির হন এবং সেখানে নূতন এক রাজ্যের পত্তন করেন। পুনরায় গৌতম বুদ্ধের সময়ে 'দজরাজা' নামে আর একজন রাজা ভারতবর্ষ থেকে এসে ইরাবতী তীরে আর এক নগরীর পত্তন করেন। যাই হোক এইভাবে প্রাচীন ব্রহ্ম রাজবংশকেও প্রাচীন ভারতীয় রাজকুলের সঙ্গে সম্পর্কীত করা হয়। আরাকান কাহিনী "রাজাওয়েং' এ ও তাদের প্রাচীন রাজবংশের আদি পুরুষকে বারানসী থেকে আগত বলে দাবী করা হয়েছে। কাহিনীতে পরে এই রাজবংশের সঙ্গে পূর্বোক্ত কান–রাজগি্যর বংশ ধারাকে মিলিয়ে দিয়ে এক নতুন রাজবংশের সৃষ্ঠি করা হয়েছে। আবার বংশ কেবল প্রাচীন হলেই হয় না, বংশ তালিকা দীর্ঘ না হলেও বংশের মান বাড়ে না, সে কারণে অভিরাজের পূর্বেও অগণিত রাজার কথা উল্লেখ আছে, " The history of kings commencing from Maha Thamada upto the time of excellent 'Para Gaudama' there being 334, 569 kings in regular succession." (Capt, C. J. F. S. Forbes: Legendary history of Burma and Arakan, 1882) যাই হোক, মনে হয় চাকমা রাজ বংশের ফরমায়েশী ইতিহাস রচনাকালেও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিত বিশ্বব্যাপী প্রচলিত এই গতানুগতিক রীতিকে লংঘন করতে পারেননি। শাক্য বংশ থেকে উৎপত্তির কাহিনীটি কবে থেকে প্রচলিত ছিল ঠিক বলা যায় না তবে চাকমা রাজাগণের সূর্যোবংশোদ্ভুত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সম্ভবতঃ খুব বেশী দিনের কথা নয়। হাচিনসন তাঁদের সূর্য বংশীয় বলে উল্লেখ করলেও সতীশ চন্দ্র ঘোষ সে প্রসঙ্গে কিছুই বলেননি বরং ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পরোক্ষভাবে তাঁদের চন্দ্র বংশীয় বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন– "পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা মঘ নরপতিগণ অল্পকালের মধ্যে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কৃপায় চন্দ্র বংশজ বলিয়া অ্যাখ্যাত হইযাছেন" (রাজ মালার উদ্ধৃতি, 'চাকমা জাতি' পৃঃ ১৮১) মনে হয় গ্রহাচার্য প্রমূখ "ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ" প্রথমদিকে তাঁদের চন্দ্র বংশজ বলে দাবী উথাপন করে বিশুদ্ধ হিন্দু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে বোধ হয় অন্য কোন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের দ্বারা সেই অসংগতি সংশোধন করা হয়। চাকমাগণ ধর্মে বৌদ্ধ। যেহেতু বুদ্ধ শাক্যকুলজাত,

শাক্যকুল আবার সূর্য বংশোজাত, সুতরাং এই মতকে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ। তা'ছাড়া সূর্যবংশের গৌরব চন্দ্রবংশের তুলনায় একটু বেশী হওয়ারই কথা–অতএব ডবল লাভ।

ইতিহাস বনাম পুরাণ কাহিনী

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে চাকমা রাজন্যবৃন্দের পূর্ব পূরুষগণকে সূর্যবংশীয় বলে দাবী উথাপন করা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসরণে নিজেদের বংশ গৌরব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সেই দাবী রাজবংশের উপর একটু অলৌকিত্বের মাহাত্ম্য বিস্তার করে। দুনিয়ার তাবৎ রাজা মহারাজা যেখানে Divine right ঘোষণা করে এসেছেন সেখানে চাকমা রাজগণের পক্ষে সূর্য বংশোদ্ভুত হওয়ার দাবী একটি নেহাৎ মামুলী ব্যাপার মাত্র। বৌদ্ধ ও হিন্দু এই দুই মিশ্র ভাবধারায় লালিত প্রজাবৃন্দের ধর্মীয় অনুভূতিকে একাধারে ভগবান বুদ্ধের, অন্যধারে শ্রীরাম চন্দ্র প্রভৃতি অবতারবৃন্দের বংশ গৌরব দাবীর মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে তাদের কাছ থেকে রাজ বংশের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার এর চাইতে উত্তম পন্থা আর নেই। পূর্বেই বলা হযেছে, এই কাহিনী আর যাই হোক ইতিহাস নয়। পুরাণ কাহিনী হিসাবে এর মূল্য চিরকালই থাকবে, কিন্তু সুদীর্ঘ বংশ তালিকা সহ প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে একে জুড়ে দিলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হয়। হিন্দু পুরাণোক্ত সূর্য বংশীয় রাজন্যবৃন্দের তালিকায় আরও কয়েকশত কীর্তি ধন্য নরপতির নাম যোগ বা বিয়োগ করলেও তেমন কিছু আসে যায় না বা তাঁদের গ্রহণ করতেও তেমন আপত্তির কারণ নেই। আপত্তি শুধু এইখানে যে তাঁদের পুরাণ কাহিনীর চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং চাকমা জাতির ইতিহাস পুস্তকে আসল কাহিনীর সাথে পুরাণ কাহিনীর অংশটি জুড়ে দিয়ে রাজবংশের তথা চাকমা জাতির গৌরব বৃদ্ধি করার পরিবর্তে আজকের দিনের ইতিহাস সচেতন পাঠকদের কাছে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে না তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান ও লোকগাথা রাধামহ্ন–ধনপুদির রচনা কাল

চাকমা রাজাগণের আদি পুরুষ বলে কথিত বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান কাহিনীর সঙ্গে তাঁর সেনাপতি রাধামহ্ন ও প্রেমিকা ধনবতীর প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে

রচিত "রাধামহ্ন–ধনপুদি" এবং একই কাহিনী ধারার স্বতন্ত্র অনুবৃত্তি "চাদিগাং ছাড়া" এ দু'টি পালাগীত চাকমা ও তংটঙ্গ্যা সমাজে বহুল প্রচলিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকগাথা। গেনুকুলি বা চাকমা/তংটঙ্গ্যা চারণ কবিরা রাতের পর রাত ধরে দু'টি পালাগান গেয়ে পল্লীর জনগণের মনোরঞ্জন করে থাকেন। "চাদিগাঙ ছাড়া" বা চট্টগ্রাম ত্যাগের কাহিনী গাওয়ার সময় গানের আসরটি গ্রামের বাইরে করাই রীতি। কারণ বিশ্বাস এই যে, এ'টি গ্রামের ভেতর গাওয়া হলে গ্রামবাসীদের অমঙ্গল হয়। ফলে অতীতে চাকমা জাতির চট্টগ্রাম ত্যাগের অনুরূপ গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার মত পরিস্থিতি এবং বিষাদময় পরিণতি গ্রামবাসীদেরকেও ভোগ করতে হয়। এই বিশ্বাসের মূলে সত্য থাক বা না থাক বিস্মৃত অতীতের কোন বেদনাদায়ক স্মৃতি যে এই প্রথার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত লালিত হচ্ছে তা অনুমেয়। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে পালা গীতটির নাম যদিও 'চাদিগাঙ ছাড়া' কিন্তু চট্টগ্রাম ত্যাগের কোন প্রসঙ্গই পালাগীতে নেই–কোন সময়, কোন অবস্থায়, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের চট্টগ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে সে বিষয়ে কোন বিবরণ পালাগানে পাওয়া যায় না। বর্তমানে যে পালাটি গাওয়া হয় সেটি "রাধামহ্ন–ধনপুদি" পালারই একটি বর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। শোনা যায় আগের দিনে এই পালাগীতটিতে 'তুরুকের' সঙ্গে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ ছিল। কিন্তু আজকালকার পালায় সে সব কোন বিবরণ থাকে না। অনুমান হয়, মূল পালাটি এখন লুপ্ত হয়েছে।

পুরাণ কাহিনী অনুযায়ী সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু থকে শুরু করে খ্যাত অখ্যাত অনেক রথী মহারথীর এই বংশধারা শেষ পর্যন্ত ১৪৩তম পুরুষ শাক্যকুলসিংহ সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধে এসে থেমেছে। আমরা জানি তৎপুত্র রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সূর্য বংশ থেকে উদ্ভুত শাক্যবংশের মূল ধারা এখানেই শেষ হয়। কিন্তু কাহিনীতে শাক্যকুলের আর এক শাখা লাঙ্গল ধনকে বুদ্ধের সমসাময়িক ধরা হয়েছে[৫]। এই বংশ ধারার পরবর্তী দশম (কার ও মতে একাদশ, আবার কারও মতে চতুর্দশ) পুরুষ আলোচ্য রাজা বিজয়গিরি। প্রতি পুরুষে গড়ে ৩০ বছর ধরে হিসাব করলে বুদ্ধের সময় থেকে ১০ম বা ১১শ পুরুষে বিজয়গিরির রাজত্ব কাল দাঁড়ায় মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ আজকের দিন থেকে প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্বে। সতীশ চন্দ্র ঘোষ বিজয়গিরি কাহিনীর ঘটনাকাল চতুর্থ বা পঞ্চম

৫· শাক্যকুলীয় এই নূতন শাখার বিবরণ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাণ কাহিনী থেকে চয়ন করা হয়েছে কিনা তা' আমার জানা নেই। তবে যতদুর মনে হয় এটি কোন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের (সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত গ্রহাচার্য শঙ্খরাচার্যের) সৃষ্ট অর্বাচীন পুরাণ। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পন্ডিতগণ আলোকপাত করলে সকলেই উপকৃত হয়।

শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন। পক্ষান্তরে বিরাজ মোহন দেওয়ান অনুমান করেছেন ৫৯০ খৃষ্টাব্দ। তারা কোন সূত্র থেকে এই অনুমান গ্রহণ করেছেন জানিনা। বিরাজ মোহন দেওয়ান লাঙ্গলধনকে বুদ্ধের সমসাময়িক ধরেননি। তিনি বৌদ্ধ কাহিনীতে বর্ণিত রাজা বিরূঢ়ভের শাক্যবংশ ধ্বংস করার কাহিনী এবং শাক্যগনের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। ঐ ঘটনার সময় বুদ্ধ জীবিত ছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী সুধন্য নামে জনৈক রাজার পৌত্র চম্পক কলি, তারই পুত্র লাঙ্গলধন। সুতরাং সেই হিসাবে লাঙ্গল ধন ছিলেন বুদ্ধের কয়েক পুরুষ পরবর্তী ব্যক্তি। কিন্তু তা' হলেও এত বৎসরের (প্রায় ৮০০ বৎসর) ব্যবধান হতে পারেনা। অন্যান্য লেখকদের কাহিনীতে কিন্তু লাঙ্গলধনকে বুদ্ধের সমসাময়িক ধরা হয়েছে। কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দ মোহনের বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

যাই হোক, রাজা বিজয়গিরি লোককাহিনীর একজন কল্পিত পুরুষ না সত্যই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে শিক্ষিত চাকমা সমাজে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর বইয়ের পাদটীকায় লিখেছেন "কেহ কেহ এই বিজয়গিরি ও সমরগিরিকে ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মানিক্য ও অমর মানিক্যের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন। কিন্তু নামগত এই সামান্য সাদৃশ্য ভিন্ন ইহাদের জীবনীতে কোন মিল পাওয়া যায়না" (চাকমা জাতিঃ সতীশ ঘোষ, পৃষ্ঠা নং ১১)। তদ্রূপ চম্পকনগরের অবস্থান সম্পর্কেও বিভিন্ন মত প্রচলিত। সতীশচন্দ্র ঘোষ এটিকে পার্বত্য ত্রিপুরায় অবস্থিত বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ক্যাপ্টেন লুইন এটিকে ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ভগলপুরের নিকট প্রাচীন চম্পাপুরী বলে ধারণা করেছেন (দ্রঃ C. H. T Dwellers therein by Capt. Lewin, Page-62)। অতীত এবং বর্তমান ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বহু চম্পাপুরী বা চম্পকনগরের নাম পাওয়া যায়, এ কারণে এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক।

লোককাহিনী "রাধামহ্ন-ধনপুদি" তে বর্ণিত বিবরণ ছাড়া বিজয়গিরি সম্পর্কে আর কোন স্বতন্ত্র কাহিনী নেই। এই কাহিনীতেও তাঁর রাজ্যাভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজিত রাজ্যে ফিরে যাওয়ার বিবরণ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই বলা হয়নি। পালাগীতে বিজয়গিরি একটি গৌণ চরিত্র। মূল চরিত্র রধামহ্ন ও ধনপুদির প্রেম কাহিনী নিয়েই পালাগীতের ঘটনা প্রবাহ আবর্তিত।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে সকল ইতিবৃত্তকারই বিজয়গিরি কাহিনীর

সঙ্গে যুক্ত কাব্য কথা "রাধামহ্ন-ধনপুদি" এবং "চাদিগাঙ ছাড়া" পালা দু'টিকে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গণ্য করে ইতিহাস আলোচনায় এই পালাগানগুলি থেকে ঘন ঘন উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিহাসের প্রামাণ্যতা হাজির করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, পালাগীতের ভাষায়, পারিপার্শ্বিক বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রনে, ঘটনা বিন্যাসে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে পালাগান দু'টিকে নির্তান্ত অর্বাচীন কালের রচনা বলে মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন এর রচনাকাল ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ (রাধামহ্ন-ধনপুদিঃসুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা সম্পাদিত, মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, জাঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১ম খন্ডের ভূমিকা দ্রঃ)। রাজা ভূবনমোহন রায় বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান ও রাধামহ্নের যুদ্ধাভিযানের ঘটনা দু'টি আলাদা আলাদা সময়ে সংঘটিত, এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে রাধামহ্নের যুদ্ধাভিযানের সময় এবং চাদিগাঙ ছাড়া পালার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চর্তুদশ শতকের গোড়ার দিকে। তবু ভাল যে পালাগীতে বর্ণিত ঘটনাকাল ও পালাগীতের রচনাকাল সম্পর্কে আজকাল পাঠকগণের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সতীশ ঘোষ প্রমুখ ইতিবৃত্তকারগণের পুস্তক পাঠে মনে হয় যে ঘটনাকাল ও রচনাকালের মধ্যে তাঁরা বড় একটা পার্থক্য বোধ করেননি।

কাহিনীতে মঘ ও মোগলদের (কোন কোন গেংকুলির বর্ণনায় তুরুক) সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ভারতে মোঘল শক্তির আবির্ভাব ঘটে মাত্র ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে। তার অনেক পরেই এ অঞ্চলে তাদের আগমন। পালা গীতটির রচনাকাল সম্বন্ধে ইতিবৃত্তকারগণের সর্বশেষ অনুমিত কাল চর্তুদশ শতকেও এ অঞ্চলে মোগলশক্তির উপস্থিতি ছিল না। কাহিনীর একটি চরিত্র কামিজধন। কামিজ একটি আরবী শব্দ। এত বছর পূর্বে আরবী শব্দ এখানে আসার সম্ভাবনা কোথায়? কামিজধনের প্রেমিকা কামিজবী, তার সহচরী নীলংবী, কুঞ্জবী, মেইয়াবীদের নামের শেষে "বী" কথাটি ফারসী "বিবি" শব্দ থেকে আগত বলে অনেকের বিশ্বাস। ফরাসী ভাষা মাত্র মুসলামন অধিকার সূত্রেই এদেশে এসেছে। কাহিনীর একটি রসিক চরিত্র ১২০ বৎসরের বৃদ্ধ "আজু চলাবাপ" ছিলেন গ্রামের "খীঝা"। রাধামহ্নের প্রেমিকা ধনবতীকে কেউ কেউ নীলগিরির, কেউ কেউ জয়মঙ্গল খীঝার কন্যা বলে বর্ণনা করেন। রাধামহ্ন প্রথমে সেনাপত্যের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য "এয়াজি" বা প্রতিনিধি হিসাবে জয় নারায়ণ রোয়াঝাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। এই খীঝা, রোয়াঝা প্রভৃতি মঘী পদবীগুলি সেখানে তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকার কোন কথা নয়। গেংকুলি গণ এই কাহিনী গাওয়ার সময় অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক রেডিমেড পদ ব্যবহার

করেন। যেমন–

> "হাবুলাং রাজা কুগি চিত রোগোনি পাদা খজা ডিগ'
> "সিক্যা টেঙালোই ধান কিনিম হিধত উধিলে নাং ঘিনিম।'
> তাগল জুগাল্য খন্ডলে মুই দ ন চিনং গমডোলে।"
> কুম্মুয়া কিনি শিলক্যা দেল ধনপুদি রাধামহনরে আধিক্যা"
> ইত্যাদি

হাবুলাং (Howlong) কুকিদের নাম শোনা গিয়েছিল মাত্র সেদিন। সিক্যা টাকার ব্যবহারও লুপ্ত হয়েছে বেশী দেরী হয়নি। নেয়াখালীর খন্ডল এবং চন্দ্রঘোনার পাশে শিলক ইউনিয়নের নাম চতুর্থ পঞ্চম এমন কি চর্তুদশ পঞ্চদশ শতকেও থাকা সম্ভব কি ?

> "সা'বে বান্‌ল্য রনপুধি, বিদ্যাসুন্দর গমপুধি,
> কপুদির গর্ভে জন্মেল ধনপুদি।"

কাব্যে পদমিলের প্রয়োজনে গেংকুলিদের গানে উপরের প্রথম চরণের ঘন ঘন আবৃত্তি শোনা যায়। "রণপুধি' শব্দটির কোন অর্থ হয়না। মনে হয় এই শব্দটি হবে আসলে রণকুঠি অর্থাৎ দুর্গ। তাই যদি হয় তবে সাহেব বা ইংরেজদের দুর্গ তৈরীর ইঙ্গিত পাই। এমতাবস্থায় এটি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এ অঞ্চলে ইংরেজদের আগমনের পর, বিশেষতঃ চাকমা রাজা জান বক্স খাঁনের সংগে তাদের সংঘর্ষের পরই রচিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। প্রথম চরণে 'বিদ্যাসুন্দর পুঁথি'র নাম পাচ্ছি। অষ্টাদশ শতকে রচিত চট্টগ্রামী কবি নিধিরাম বসুর হাতে লেখা বিদ্যাসুন্দর পুঁথি চাকমাদের ঘরে এখনও দু'একটি পাওয়া যায়। একারনে এই পুঁথিটি এককালে চাকমাদের মধ্যে সবিশেষ আদৃত ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং গেনৃকুলি গানে পুঁথিটির উল্লেখ থাকা আশ্চর্য নয়। পালা গীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে পালাগীতটির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অথবা খুব বেশী প্রাচীন হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে নয়। পালাগীতের ভাব, ভাষা এবং ঘটনাবলীর প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে তর্কাতীত ভাবে প্রমাণ করা যায় যে উক্ত পালাগুলি নিতান্ত অর্বাচীন কালের রচনা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পূর্ব থেকেই চাকমাদের পরিচয় ছিল যদিও নিজেদের হাতে প্রকৃত ভাষা চর্চা সম্ভতঃ তখনও শুরু হয়নি। রোয়াং বা দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলা পুঁথি সাহিত্যের সাথে তাদের পরিচয় আরও ঘণিষ্ট হয়। অনুমান হয় যে সে সময় থেকেই বাংলা পুঁথি সাহিত্যের

অনুকরণে চাকমা কবিগণ কর্তৃক বিভিন্ন পালা, বারমাসী, চৌতিশা প্রভৃতি রচিত হতে থাকে। সাধু শিবচরণের রচিত বলে কথিত "গোঝেন লামা" নামে গীত পদটিও সেই সময়কারই রচনা বলে অনুমিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পালাগানের গায়ক 'গেনকুলি' কথাটিও বাংলা গায়েন শব্দের উত্তর অলি বা আলি প্রত্যয়যোগে ব্যুৎপন্ন বলেই বিশ্বাস। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ জাতীয় লোকসঙ্গীত চর্চার ইতিহাসও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের।

বিজয়গিরি আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক মূল্য

"রাধামহ্ন–ধনপুদি" গীতি কাব্যটিকে অর্বাচীন কালের একটি কবিকৃতি হিসাবে ধরে নিলে কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য তেমন থাকে না, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কাব্যটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি হলেও মূল কাহিনীটি অর্থাৎ বিজয় গিরির রাজ্যাভিযানের কাহিনী কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা? আমাদের মনে হয় কাব্যটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে রচিত হলেও পালাগীতের অন্তর্গত বিজয়গিরির রাজ্য জয়ের কাহিনীটি পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কবি পরবর্তীকালে মূল কাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র যুক্ত করে কাহিনীটিকে একটি সালঙ্কার কাব্যরূপ দেন। পরে পরে মূল কাহিনীটি গৌণ হয়ে পড়ে এবং প্রেমোপ্যাখ্যানটিই কাব্যে মূখ্য হয়ে উঠে। রাধামহ্ন ধনবর্তী' কাব্য কথা রচিত হওয়ার পূর্ব থেকেই যে চম্পক নগরের যুবরাজ বিজয়গিরির রাজ্যাভিযানের কাহিনীটি প্রচলিত ছিল একটি পরোক্ষ সূত্র থেকে সে সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়।

চাকমাদের একটি দল দৈংনাকরা সুদীর্ঘকাল পূর্ব থেকে আরাকানে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাদের কথা নূতন করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন Sir Arthur Phayre তাঁর ১৮৪১ সালে প্রকাশিত "An account of Arakan" নামক নিবন্ধে। উক্ত নিবন্ধে দৈন্নাকদের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মাত্র নীচের কয়েকটি কথা লেখেন: "The remaining hill tribes are the Doingnak and the Mrung. They both inhabit the upper course of the Maya river. The language of the first is a corrupt Bengalie. They call themselves kheim-ba-

nago Of their discent I could learn nothing; probably they may be the offspring of Bengalees carried into the hills as slaves, where their physical appearance has been modified by change of climate. In religion they are Buddhists." (Lient. Phayre; An account of Arakan, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1841). ফেইরী বলছেন যে দৈন্‌নাকরা নিজেদের "খেইম বা নগো" বলে পরিচয় দেয়। এই 'খেইম বা নগো' কথাটির অর্থ কী ? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে আরাকানী ভাষায় বা প্রতিবেশী কোন উপজাতীয় ভাষায় শব্দটি'র কোন অর্থ হয় না। সুতরাং আমাদের কেবল অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হয়। অনুমান হয় যে ফেইরীর সঙ্গে আলাপ করার সময় তারা আসলে নিজেদের চম্পানগরের লোক বলেই পরিচয় দিয়েছিল। ফেইরী সে সময় ছিলেন লেফ্‌টেন্যান্ট পদমর্যাদার একজন তরুণ অফিসার। সেই তরুণ বয়সে তিনি আরাকানী ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ কোন আরাকানী দোভাষীর মাধ্যমেই তাঁদের কথাবার্তা চলেছিল। আরাকানী ভাষায় শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় না। অতএব চম্পক নগর শব্দটির উচ্চারণ আরাকানী দোভাষীর উচ্চারণে "চেইম্পানগো" হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এই চেইম্পানগো শব্দটিকে শোনার ভুলে হোক বা নোট করার ভুলে হোক ফেইরী 'খেইম বা নগো' লিখেছেন। এ'টি নিছক অনুমান। এই অনুমান ছাড়া দৈননাকরা [৬] নিজেদের খেইম বা নগো হিসাবে পরিচয় দেওয়ার আর কী অর্থ হতে পারে আমরা ভেবে পাইনা। দৈন্‌নাকদের মধ্যে বরাবরই চম্পকনগরের বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান সম্পর্কীত জনশ্রুতি প্রচলিত এই ধারণার

৬· দৈন্‌নাকরা বর্তমানে উত্তর আরাকানের রাসিডং, ভূসিডং ক্যক্‌ত প্রভৃতি স্থানে বাস করে। তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানা নেই। সাম্প্রতিক কালে যাঁরা ঐ অঞ্চল ঘুরে এসেছেন তাঁদের অনুমানে বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৩০/৪০ হাজার। ১৯২১ সালে বর্মার আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা ধরা হয়েছিল ৪৯১৫ জন। ফেইরী তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধের পরিশিষ্টে দৈন্‌নাক ভাষার ৩৮ টি শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকী যাবতীয় শব্দই চাকমা শব্দ। কেবল তীর (arrow) শব্দের দৈননাক প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে 'লে' যা ম্রো ভাষায় ব্যবহৃত। শব্দের বানান থেকে বোঝা যায় উচ্চারণ একটু ভিন্ন। জানা যায় যে

কারণ এই যে আরাকানবাসী দৈন্‌নাকদেরই প্রত্যাগত অংশ তংচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকই আজ পর্যন্ত সেই একই বিশ্বাসে গভীর ভাবে বিশ্বাসী। দৈন্‌নাকদের সংগে এ অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কম করে হলেও প্রায় ৩০০ বছর। ইতিপূর্বের আলোচনা অনুযায়ী রাধামহ্‌ন–ধনপুদি উপাখ্যান সহ চম্পকনগরের বিজয়গিরির গোটা কাহিনী যদি উনবিংশ শতাব্দী বা তারও কিছু পূর্বে রচিত বলে অনুমিত হয়। তবে দৈন্‌নাকদের মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেইরীর আমলে সেটি প্রচলিত হওয়ার কথা নয়। সুতরাং রাজা বিজয়গিরির নেতৃত্বে চম্পকনগর থেকে দক্ষিনাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে আসার পর তারা আর পূর্ব স্থানে ফিরে না গিয়ে এ অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল। দৈন্‌নাকসহ চাক্‌মা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সে বিশ্বাসের মূলে অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। বিজয়গিরির নামে প্রকৃত কোন রাজা বা রাজপুত্র না থাকতে পারে, মঘ মোগলের সংগে যথার্থ কোন সংঘর্ষ না হতে পারে কিন্তু কোন বিস্মৃত অতীতে কোন দলপতির নেতৃত্বে চাক্‌মাদের একটি দল সে মূল দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরের কোন অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমে ক্রমে রোয়াং বা আরাকান অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল এ কাহিনী তার ইঙ্গিত দেয়। সেই অভিযান প্রকৃত যুদ্ধাভিযান নাও হতে পারে; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে নুতন আশ্রয়ের সন্ধানে সে অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়।

অষ্টাদশ পর্ব বিভক্ত বিশাল মহাকাব্য মহাভারতকে একটি মহত্তম কবি কল্পনা ছাড়া কেউ ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করেন না। তার অসংখ্য অতিমানবীয় চরিত্রগুলিকে এবং অগনিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে ইতিহাস বলে স্বীকার করা না গেলেও পন্ডিতেরা মনে করেন মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে অন্ততঃ দু'একটি ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, যার একটি হচ্ছে সুদুর অতীতের কোন এক সময়ে কুরু ও পান্ডব নামে দুই জনগোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ। বেদব্যাস হোন বা বেদব্যাস অথবা ছদ্মনামে কোন অমিত প্রতিভাশালী কবি হোন এই কাঠামোটির উপর প্রয়োজনীয় রূপ, রস, রং সংযোজিত করে তাকে অপরূপ অবয়ব দিয়ে একটি বিশালাকার কাব্যমূর্তি নির্মান করেছেন। তেমনি বিজয়গিরি আখ্যায়িকার মূলেও যে একটি প্রকৃত ইতিকাহিনী লুকিয়ে নেই তা হলফ করে বলা যায় না।

তাদের উচ্চারণ এখানকার ধন্যা–গঝা তঞ্চঙ্গ্যাদের অনুরূপ। অন্যান্যদের সংগে কথা বার্তা বলার সময় তারা আরাকানী ভাষা ব্যবহার করলেও নিজেদের মধ্যে চাক্‌মা ভাষাই ব্যবহার করে। তাদের ভাষায় বর্তমানে কিছু কিছু আরাকানী শব্দ প্রবিষ্ঠ হয়েছে। মেয়ে পুরুষ সকলেই বর্মী লুঙ্গি বা থামি ব্যবহার করে।

রাজা সিরিত্তমা প্রসংগ

প্রচলিত কাহিনীতে বিজয়গিরির ঠিক পরবর্তী রাজা সিরিত্তমা। কাহিনীতে বলা হয়েছে যে বিজয়গিরির কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তার মন্ত্রী সিরিত্তমা রাজা হন। সিরিত্তমা নামটির বানান বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। সতীশ ঘোষ লিখেছেন ছিরীত্তমা, বিরাজ মোহন দেওয়ান সিরিত্তমা, মাধব কর্মী শ্রীউত্তম, প্রাণহরি তালুকদার শ্রীত্তামা ? স্পষ্টই ছিরীত্তমা নামটি বিজাতীয় বোধ হওয়ায় নাম সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

আসল বানানটি যাই হোক, এখানে সিরিত্তমা বানানটি ব্যবহার করা হবে। আমরা এই সিরিত্তমা নামটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই লুইন কর্তৃক তাঁর বইয়ে উদ্ধৃত ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার [৭] একটি চিঠিতে। চিঠিটি দীর্ঘ। পূরো চিঠিটি না পড়লে চিঠির প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা যাবেনা। তাই২ পুস্তকের পরিশিষ্টে লুইনের বইয়ে উল্লেখিত পূরো চিঠিটি যোগ করা গেল। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, সিরিত্তমা প্রসঙ্গটি পড়ার আগে তাঁরা যেন পরিশিষ্টে ঐ চিঠিটি ভাল করে পড়ে দেখেন। ✒

ক্যাপ্টেন লুইন ব্রহ্ম সম্রাটের উক্ত চিঠিতে উল্লেখিত Sery-Tumah Chuckah কে একজন চাকমা রাজা হওয়া সম্পর্কে কোন অনুমান ব্যক্ত করেননি। সতীশ চন্দ্র ঘোষই সর্ব প্রথম সিরিত্তমাকে একজন চাকমা রাজা হিসাবে কল্পনা করেন। "ব্রহ্মদেশীয়েরা চাকমাগণকে ছাক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ছিরীত্তমা ছাক রাজা বিজয়গিরির অনতি পরবর্তী উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশের আবহাওয়ার এত পরিবর্তন ঘটিতেছিল যে, নামটি পর্যন্ত রক্ষা পায় নাই। কোথায় উদয়গিরি, বিজয়গিরি প্রভৃতি আর কোথায় তাঁহাদিগের বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিরীত্তমা ও অতঃপর

৭· তরবুমাঃ সে সময় ব্রহ্ম সম্রাট ছিলেন বোধপ্রায় বা বোধপায়া। ১৮৮৪ সালের শেষ দিকে আরাকান জয়ের পর তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর ব্যর্থ শ্যাম অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বভাবতই সে সময় চট্টগ্রাম সীমান্তের তুচ্ছ ঘটনাবলী নিয়ে মনোযোগ দেওয়ার তাঁর অবসর ছিলনা। তা'ছাড়া ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর এত উচ্চে ধারণা ছিল যে এ সাধারণ ব্যক্তি জ্ঞানে তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেলের বহু চিঠির উত্তর দেওয়ারও তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি। সে মতাবস্থায় চট্টগ্রামের একজন সাধারণ ইংরেজ চীফকে তাঁর নিজের হাতে চিঠি দেওয়ার সম্ভাবনা কম। মনে হয় তরবুমা ছিলেন ব্রহ্ম সম্রাটের কোন প্রতিনিধি।

আমরা এই রূপ ইয়াংজ, চৌফ্রু ও চৌতু প্রভৃতি বংশদিগের কথা উল্লেখ করিব। এ স্থলে প্রাচীন নরপতিগণের শাসন বিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা কেবল অর্থ ও রক্ত পিপাসু ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার চরিত্র শোধন ও ধর্ম সাধনের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ চাকমাধীশ্বর ছিরীত্তমার শাসন প্রণালী এত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া শত্রু রাজাগণও তাহা আদর্শরূপে মানিয়া চলিয়াছেন।" (চাকমা জাতিঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ, ১৯০৯ইং পৃঃ ১৭)। আর এক জায়গায় আছে, "এই ছাক নামটি যেন চাকমা নামেরই রূপান্তর মাত্র।"-(ঐ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮)।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, লুইনের বইতে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠিতে ছিরীত্তমা নামটির বানান আছে-Serytumah Chuckah.। নামের শেষোক্ত শব্দটির বাংলা উচ্চারণ করলে দাঁড়ায় চুক্কা, চাক্কা বা ছাক্কা। এই শব্দটিকে সতীশ চন্দ্র ঘোষ কিভাবে 'ছাক' হিসাবে ধরে নিলেন এবং তাঁতে যত অনর্থের সৃষ্টি করলেন বোঝা কঠিন। Serytumah Chuckah কে একজন চাকমা রাজা হিসাবে ধরে নেওয়ার তাঁর একমাত্র হেতু-"ব্রহ্মদেশীয়েরা চাকমাগণকে ছাক নামে অভিহিত করিয়া থাকে।" ছিরীত্তমা নামের শেষে সতীশ ঘোষের পাঠ অনুসারে 'ছাক' শব্দের সংগে জাতি পরিচয় বাচক 'চাকমা' শব্দের কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত মিল ছাড়া অপর কোন সূত্র তাঁর এ ধারণার অনুকুলে আর কোন ইঙ্গিত বহন করে না। এই তুচ্ছ জিনিসটিকে ভিত্তি করে সতীশ ঘোষের পক্ষে এত বড় মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যথেষ্ট হয়নি। ছিরীত্তমাকে একজন চাকমা রাজা হিসাবে ধরে নেওয়ার পূর্বে তাঁকেও যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়, কারণ প্রথম দিকে তিনি কেবল "সম্ভাবনা'র কথাই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চাকমা জাতির পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণ সতীশ বাবুর এই অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিচার না করে বিনা দ্বিধায় সিরিত্তমাকে (নাম সংস্কার পূর্বক) চাকমা রাজাগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ করেছেন। অধিকন্তু চিঠিতে উল্লেখিত গুণাবলী ছাড়া তাঁর চরিত্রে আরও কিছু অতিরিক্ত গুণাবলী এবং জীবনে আরও কিছু অতিরিক্ত কৃতিত্ব যোগ করে তাঁকে একজন ন্যায় পরায়ণ, ধর্মপ্রাণ, রাজনীতি বিশারদ, দিগ্বিজয়ী চাকমা রাজা হিসাবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার শ্রম-স্বীকারে পরাঙ্মুখ হননি। ভুবনমোহন রায় বিজয়গিরির পরবর্তী রাজা হিসাবে সিরিত্তমাকে স্থান দেননি, তাঁর বোধহয় সন্দেহ ছিল। সে স্থলে তিনি 'সাকালিয়া' নামক একজনকে যুক্ত করেছেন। তবে সম্ভবতঃ তিনি এই সিরিত্তমাকেই 'সেরমত্যা' নাম দিয়ে ইতিহাসে অনেক পরবর্তী এক জায়গার তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। আবার পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণ

ভূবন মোহন রায় সৃষ্ট (?) সাকালিয়া এবং সেরমত্যা এ দু'টি চরিত্রের কোনটিকেই বাদ না দিয়ে তাঁদের পুস্তকের বংশ তালিকায় যার যেখানে সুবিধা মনে হয়েছে, সেখানেই এই অতিরিক্ত দু'জনের স্থান করে দিয়েছেন। এভাবে ইতিহাসের কলেবর অযথা বৃদ্ধি হয়েছে। যাই হোক, এবার সিরিত্তমার প্রকৃত পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

তরবুমার উপরোক্ত চিঠিতে রাজা সিরিত্তমা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, ন্যায় পরায়ণ, ধর্মপ্রাণ একজন আদর্শ রাজা হিসাবে চিত্রিতে হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সময়ে যেভাবে স্বর্গ থেকে স্বর্ণ এবং রত্নবৃষ্টি ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ চিঠিতে দেওয়া আছে, তাতে তাঁকে একজন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ ভাবা কঠিন। তবে মনে রাখতে হবে যে আধুনিক কালের ন্যায় কূটনৈতিক রীতি পদ্ধতি মেনে বাস্তবতা সম্মত একটি চিঠি সেকালের ব্রহ্ম রাজ দরবার থেকে আশা করা যায় না। এ চিঠি পড়ে লুইন সাহেবও মজা পেয়েছিলেন। চিঠির প্রকৃতি সম্বন্ধে লুইন মন্তব্য করেছেন। "His majesty of the golden foot and the white elephant writes in a broad umbrageous manner........it marches in broad epic periods, with a roll as of deep toned gongs and barbaric clash of cymbals......."(Lewin, The hill tract of Chittagong and the dwelers therein, 1869) স্কুল পাঠ্য পুস্তকে আগেকার দিনের মহান রাজাদের জনহিতকর কাজের ফিরিস্তি যে ভাবে দেওয়া থাকে সে ভাবে "পথিকগণের কল্যাণের নিমিত্ত পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, পান্থশালা নির্মাণ" ইত্যাদি সৎকার্য সম্পাদনের কৃতিত্ব ও রাজা সিরিত্তমাকে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি সর্বদাই তিনি "Five books" অধ্যায়ন করতেন। ত্রিপিটক না বলে এই "পঞ্চশাস্ত্র" কাকে বোঝানো হয়েছে বলা কঠিন। তবে,——"abstained from flesh of pigeons, goats, hog and of fowl, wickedness and theft adultiry, falsehood and drinking." এই কথাগুলির দ্বারা বৌদ্ধ গৃহীগণের পালনীয় পাঁচটি মূলনীতি বা পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে একথা স্পষ্ট।

ব্রহ্ম রাজ (?) তরবুমা সিরিত্তমা নামে কাকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। চিঠির বর্ণনানুযায়ী তিনি আরাকান চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই কোন

রাজা। কারণ চিঠিতে সে অঞ্চল পূর্বে মোগল এবং অমরপূরের (স্পষ্টই ত্রিপুরা রাজ) রাজাগণের অধিকার ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। সতীশ বাবুর ছিরীত্তমা ছাক নামটির বানান্ লুইনের বইতে দু'ভাবে আছে। এক জায়গায় Serytumah Chuckah, আর এক জায়গায় Sery-Tumah Cuckah [৮]।

বর্মী আরাকানী ভাষার একটি শব্দ প্রথমে বর্মী থেকে ফারসী, সেখান থেকে ইংরাজী, সেখান থেকে পুনরায় বাংলায় প্রতি বর্ণিত করতে গেলে যে অবস্থা দাঁড়াতে পারে এ ক্ষেত্রে ও পরিণতি তাই দাঁড়িয়েছে–অর্থাৎ মূল নামটি কি ছিল তা নির্ণয় করা দুষ্কর। চিঠিতে রতনপুর, দুগ্গাদি প্রভৃতি যে সব স্থানে নামোল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির প্রকৃত উচ্চারণও কি ছিল বলার উপায় নেই। আমরা জানি Ava'–এর প্রাচীন নাম ছিল রতনপুর, Sandoway-র প্রাচীন নাম ছিল দ্বারাওয়াদি। এই দ্বারাওয়াদি শব্দটি চিঠিতে দুগ্গাদি হয়েছে বলে মনে হয়। চিঠিতে আরো অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের নাম করা হয়েছে তাদের কয়েকটির নাম বা তাদের কাছাকাছি নাম বর্মার ম্যাপ খুললে এখনও পাওয়া যায়। ব্রহ্ম–আরাকান ইতিহাসের আদিকাল থেকে রাজবংশ পঞ্জিতে সিরিত্তমা নামে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম অথবা বাংলার ইতিহাসেও এই নামে কোন রাজার নাম শোনা যায়নি।

চিঠির প্রসঙ্গ অনুসরণ করলে তাঁকে হয় উপমহাদেশের কীর্তিমান রাজা 'শ্রীসুধম্মা' বা 'থিরি থুধম্মা' এই দু'জনের মধ্যে একজন হবেন বলে অনুমান করা যায়। উভয় নামের সংগে Sery-Tumah Chuckah নামের ধ্বনিসাযুজ্য লক্ষনীয়।

ব্রহ্ম রাজ বা তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। কাজেই তাঁর পক্ষে ইতিহাস খ্যাত মহান বৌদ্ধ সম্রাট "শ্রীধম্মাশোকে"র আদর্শ অনুসরণের গর্ব করা স্বাভাবিক। সেই সময়ের ব্রহ্মরাজ বোধপায়াও নিজেকে সম্রাট অশোকের বংশধর বলে দাবী করতেন—"Bodhopra made a suitable reply,

---

৮: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত Bengal District Records (Chittagong) গ্রন্থে উদ্ধৃত ব্রহ্ম রাজের এই চিঠিতে Serytumah Chuckah কে একেবারে Sery-Tumah Chuckmah বানানো হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর সহকর্মীরা অথবা তাঁদের পূর্ববর্তী কেউ চিঠির অনুলিপি প্রস্তুতকালে ভুল করেছেন। এভাবেই ভুলের জঞ্জাল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

referring to the acts of his great ancestor Asoka, whose example he intended to follow in support of religion." (Sir Arthur Payre; History of Burma; 1883, P. 225) সম্রাট অশোকের ধর্ম প্রচার ও জনহিতকর কাজগুলির কথা এবং সমগ্র বৌদ্ধ জগতে তাঁর খ্যাতির বিষয় স্মরণ করলে চিঠির বর্ণনার সঙ্গে তাকে মেলানো কষ্টকর হয় না।

সিরিত্তমার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের দ্বিতীয় অনুমান তিনি আরাকানাধিপাতি থিরি থুধম্মা (১৬২২-৩৮) চিঠির প্রসঙ্গানুযায়ী সিরিত্তমার মোগল শাসনামলের কিঞ্চিৎ পূর্ববতী কালের আরাকান-চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন রাজা। চিঠিতে বলা হচ্ছে যে এই রাজ্য পূর্বে মোগল রাজা এবং অমরপুরের (ত্রিপুরার রাজধানী) রাজা কর্তৃক শাসিত হয়। তাঁদের পূর্বে এই রাজ্য ছত্রধারী (Chetter dury) রাজাগণ শাসন করতেন। কিন্তু সে সময় শাসন ভাল ছিলনা। অতঃপর সিরিত্তমা এ অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বর্ণনা থেকে সিরিত্তমাকে মোগল রাজের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী রাজা হিসাবে ধরতে হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ অঞ্চল মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা শক্তির পদানত ছিল। মোগল শক্তি এ অঞ্চলে মাত্র সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই পাকাপাকিভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। মোগল সুবাদার শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু পর্যন্ত দখল করেন। থিরি থুধম্মা ছিলেন তার বছর কয়েক পূর্বেকার আরাকান রাজ। সুতরাং চিঠিতে উল্লেখিত সিরিত্তমাকে আরাকান রাজ থিরি থুধম্মা হিসাবে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। এই অনুমানের আর একটি মূল্যবান পরোক্ষ সাক্ষ্য চিঠিতে পাওয়া যায়। চিঠির এক জায়গায় আছে, সেই সময় বুদ্ধদত্ত বা শ্রীবোত ঠাকুর (Sery boat Thakoor) নামে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আরাকানে এসেছিলেন, যিনি লোকজনকে এবং পশুকুলকে পর্যন্ত ন্যায়নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যাঁর প্রদর্শিত নীতি অনুসারে পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত দেশ শাসিত হয়। ফলে দেশে শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। ব্রহ্ম সম্রাট এই শ্রীবোত ঠাকুর এবং সিরিত্তমার প্রদর্শিত ন্যায়নীতি অনুসারেই দেশ শাসন করে থাকেন।

পশুকুলকে ন্যায়নীতি শিক্ষাদান এবং "পাঁচ হাজার বছর" ইত্যাদি অলংকৃত অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিলে আমাদের মনে করতে বাধা নেই যে শ্রীবোত ঠাকুর নামক কোন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদের আদর্শই অনুসৃত হওয়ার কথা চিঠিতে বলা হয়েছে। আমরা জানি "পাদ্মাবতী" কাব্যের রচয়িতা সুবিখ্যাত কবি আলাউলের

পোস্টা মাগন ঠাকুরের পিতা ছিলেন আরাকানের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীবড় ঠাকুর–যার প্রশংসায় আলাউল পঞ্চমুখ।

শ্রী বড় ঠাকুর সম্পর্কে আলাউলের দু'টি পদ নীচে উদ্ধৃত হলো–

"রাজ্য পাল সৈন্য মন্ত্রী আছিলেন তাত।
শ্রীবড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত।।"

(সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান)

"রাজ সৈন্য–মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর। ৯
প্রভুত মাগিয়া পাইল কুলদীপ সুর"

(পদ্মাবতী কাব্য)

চিঠি পড়ে মনে হয় আরাকান রাজের এই বিচক্ষণ মন্ত্রী শ্রীবড় ঠাকুরই চিঠিতে উল্লেখিত শ্রীবোত ঠাকুর এবং Sery tumah আরাকান রাজ শ্রীসুধম্মা। আরাকান সিংহাসনে শ্রীসুধম্মা অপেক্ষা আরও অনেক উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন সন্দেহ নেই। তাঁর পিতা Meng Khamaung-এর রাজত্বকাল ছিল আরো বেশী গৌরবোজ্জ্বল তবু কেন তরবুমা শ্রীসুধম্মাকে একজন আদর্শ রাজা হিসাবে বিবেচনা করলেন তারও কতগুলি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। আরাকান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীসুধম্মার সময়কাল থেকে ব্রহ্মরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান জয় পর্যন্ত দীর্ঘ দেড়শত বৎসর কালের মধ্যে শ্রীসুধম্মা অপেক্ষা আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজা আরাকানের সিংহাসনে ছিলেন না। আরাকানের এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরাজকতার ইতিহাস। কাজেই পূর্ববর্তী রাজাগণের তুলনায় শ্রীসুধম্মার গৌরব ক্ষীণ হলেও তিনিই আরাকান ইতিহাসে শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁর রাজত্বকালও একেবারেই গৌরবহীন বলা যায় না।– He enforced tribute from Dacca, and marched on a marauding

৯· শ্রীবড় ঠাকুর ছিলেন থিরি–থু–ধম্মার পরবর্তী আরাকান রাজ নরপদিগিয়্যির (১৬৩৮–৪৫) মন্ত্রী। সম্ভবতঃ তিনি থিরি–থু–ধম্মারও মন্ত্রী ছিলেন। থিরি–থু–ধম্মার অন্য একজন সমর সচিব (লসকর–উজির) ছিলেন চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালী আশরফ খাঁ। শ্রীবড় ঠাকুরের পুত্র মাগন ঠাকুরও নরপিদিগিয়্যির মন্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী রাজা থাদো মিন্তারের প্রধান মন্ত্রী। শ্রীবড় ঠাকুর এবং মাগন ঠাকুরের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাগন ঠাকুরকে কেউ বলেন হিন্দু, কেউ বলেন বৌদ্ধ, কেউ বলেন তিনি কোরাইশ বংশজাত মুসলমান। শ্রীবড় ঠাকুর ও মাগন ঠাকুর সম্ভবতঃ রাজ দত্ত উপাধি।

expedition in to Pegu.....He brought from thenee a trophy, a bell which hed been cast by the king of pegu, and set it up at a temple, hear the capital." (Phayre: History of Burma. 1883. P 177).

আরও একটি দিক ভেবে দেখা দরকার। ব্রহ্মরাজ বোধপায়া যে সময় আরাকান জয় করেন (১৭৮৪ খৃঃ) সে সময় আরাকান দরবারের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন প্রধানতঃ আরাকান রাজের বাঙ্গালী মুসলমান কর্মচারীগণ। নব বিজিত রাজ্যের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাঙালী অমাত্য এবং কর্মচারীবৃন্দের উপর ব্রহ্মরাজ বা তাঁর প্রতিনিধিও যে বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলেন সে কথা অনুমান করা অন্যায় হবে না। স্বভাবতই ব্রহ্মরাজ প্রতিনিধিকে সেই সমস্ত বাঙালী অমাত্যবর্গ প্রভাবিত করে থাকবে। তরবুমার উপরোক্ত ফরাসী ভাষায় লিখিত চিঠি রচনা করেছিলেন কারা ? নিশ্চয়ই বাঙ্গালী কর্মচারীবৃন্দ। শ্রীসুধম্মাই ছিলেন প্রথম আরাকানী রাজা যিনি বাংলা ভাষার পৃষ্টপোষকতা দান করেন। তিনিই প্রথম আরাকান দরবারে বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সেই কালের আরাকানী রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাঙালী ঘেষা নাম রাখেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বিশেষতঃ চন্দ্র সুধর্ম্মা (১৬৫২-৮৪) বাংলা ভাষার পৃষ্টপোষকতা দান করলেও শাহ্‌শুজা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত। শাহশুজা ও তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যার পর শাহ্‌শুজার সহযোগিতা করার বা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার সন্দেহে আরাকানের অন্যান্য মুসলমান অধিবাসীগণের উপরও নির্যাতন শুরু হয় এবং দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। অতএব শ্রীসুধম্মার প্রতি আরাকান রাজ দরবারের বাঙ্গালী অমাত্যবর্গ যে সবিশেষ প্রীত থাকবেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর স্মৃতি স্মরণ করবেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এমতাবস্থায় বাঙ্গালী উপদেষ্টাগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রীসুধম্মার প্রতি তরবুমা'র আন্তরিক শ্রদ্ধা বোধ উৎপন্ন হওয়া অত্যন্ত যুক্তিসংগত। তা'ছাড়া শ্রীসুধম্মা যে একজন ধর্মানুরাগী রাজা ছিলেন সে কথা নানাসূত্রে জানা যায়। উপরের ফেইরীর উদ্ধৃতিতেও তাঁর স্বধর্ম্মানুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীসুধম্মার ভাবমূর্তিকে ব্রহ্মসম্রাটের কাছে একজন প্রায় অতিমানব হিসাবে তুলে ধরার পেছনে যে বাঙালী অমাত্যবর্গের হাত ছিল তাতে বোধহয় সন্দেহ করার কারণ নেই। শ্রীসুধম্মা যে আরাকানবাসী বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তা' আলাওল প্রমুখ মুসলমান কবিগণের বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থে প্রশংসাসূচক পদগুলিতে

প্রমানিত হয়। এখানে তাঁর সম্বন্ধে কবি দৌলত কাজীর "সতী ময়না" কাব্য গ্রন্থ থেকে কিছু তুলে দেওয়া গেলঃ–

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাংগ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত বানু বিখ্যাত ভূবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।
দেবগুরু পূজ এ ধর্মেত তার মন।
সে পদ দর্শনে হ এ পাপের মোচন।।
পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার বদন।
নারি কি অ স্বর্গ পাত্র সাফল্য জীবন।।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ব্রহ্ম সম্রাটের চিঠিতে উল্লেখিত Sery-Tumah Chuckah আরাকান রাজ শ্রীসুধম্মা ছাড়া আর কেউ নন।নামের শেষ দিকের Chuckah কথাটি বোঝা যাচ্ছে না। শব্দটি শাহা বা শাহ্ হওয়া বিচিত্র নয়। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ "মংছমুন" ব্রহ্মরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পরে দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল বাংলায় আশ্রয় নেন। পুনরায় ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতানের সহায়তায় রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর তিনি এবং তাঁর পরবর্তী আরাকানী রাজাগণের অনেকে নিজের নামের সাথে আরও একটি অতিরিক্ত মুসলমানী নাম গ্রহণ করতেন। এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির শেষে পদবী হিসাবে ছিল শাহ (কেবল Meng Khari-এর নাম ছিল আলী খান)। সম্ভবতঃ এই শাহা শব্দটিই প্রতিবর্নীকরণের সময় Chuckah–য় পরিণত হয়। অবশ্য এটি অনুমান মাত্র। ফার্সী ভাষায় লিখিত মূল চিঠিটি পাওয়া গেলে এই রহস্যের সমাধানের সাহার্য হতো। সতীশ চন্দ্র ঘোষ বিনা বিচারে শব্দটিকে "ছাক" হিসাবে ধরে নিয়ে এই Sery-Tumah–কে চাকমা রাজা সিরিত্তমা হিসাবে কল্পনা করে বিপত্তির সূত্রপাত করেন। সার কথা এই, সিরিত্তমার আসল পরিচয় যাই হোক বাস্তবে ঐ নামে কোন চাকমা রাজা কোন কালেই ছিলেন না।

ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাস ও দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং

সতীশ চন্দ্র ঘোষ সিরিত্তমার প্রসঙ্গ শেষে আরাকান কাহিনী "দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং" এর সূত্র ধরে পরবর্তী কালের চাকমা জাতির ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। সিরিত্তমাকে তিনি বিজয়গিরির অনতি পরবর্তী চাকমা রাজা হিসাবে অনুমান করেন এবং বিজয়গিরির রাজত্বকাল অনুমান করেন "চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দী"। সেই সময়ের পর থেকে ১৩৩৩ খ্রষ্টাব্দে সংঘটিত আরাকান রাজ 'মেংদি'র সঙ্গে চাকমা রাজা বলে কথিত 'ইয়াংজ' এর সংঘর্ষের সময়ে পর্যন্ত তাঁর হিসাবে মধ্যবর্তী প্রায় হাজার বছর কালের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি দিতে পারেন নি। মাঝখানে কেবল "দেঙ্গ্যাওয়াদি"–র সূত্রে বাঙ্গালীগণের সহিত মিলিয়া চাকমাগণের প্রবল হওয়ার কাহিনী, পেগো রাজার বিরুদ্ধে অভিযান উপলক্ষে "সারস ও চর্ম" এবং "বক ও কাকের" অলৌকিক উপাখ্যান দুইটি এবং মাতামুহুরী নদীর মোহনায় মঘের সঙ্গে যুদ্ধের অবিশ্বাস্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অপরাপর ইতিবৃত্তকারগণ এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসের ফাঁক পূরণের জন্য অনেক রাজার নাম উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু সে সবে নামের সমাহার ছাড়া বিবরণ বিশেষ কিছুই নেই।

এই সময়ের ইতিবৃত্ত রচনায় 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' ছিল সতীশ বাবুর একমাত্র অবলম্বন। অপর একটি বই 'চুইজং ক্যথং' থেকে তিনি একটি মাত্র তথ্য সংগ্রহ করেন,–অতীতে বিরাট ব্রহ্ম সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত ছিল; একভাগ ছিল ব্রহ্ম রাজের হাতে, একভাগ আরাকান রাজের বাকী এক ভাগ চাকমা (সাক) রাজের। 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' নামক যে বইটির উপর সতীশ বাবু এতখানি নির্ভর করেছেন দুঃখের বিষয় সেই বইটি চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা জোগাড় করতে সক্ষম হইনি। সে বইটি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষা করার উপায় নেই। সতীশ বাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজে আরাকানী ভাষা জানতেন না এবং আরাকানী ভাষায় লিখিত সেই বই থেকে তথ্য সংগ্রহকালে তিনি অনুবাদকের সাহায্য নিয়েছেন। অনুবাদকের সাহায্যে সেটির মর্ম গ্রহণ কতখানি সফল হয়েছে তা বলা মুশকিল। দেঙ্গ্যাওয়াদি'র রচয়িতা কে? রচনাকাল কি? গ্রন্থ কাব্যের নিজের সূত্র কি? তাতে অন্তর্ভূক্ত তথ্যগুলির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে যুক্তি কি? সে কাহিনীর অনেকাংশই যে গ্রন্থকারের নিজস্ব এবং নিছক কল্পনা বিলাস নয় তার প্রমাণ কি? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত করে। তবে বইটি হাতে না পেলেও বইটিতে পরিবেশিত

তথ্যগুলি অন্যান্য প্রামাণ্য, ব্রহ্ম ইতিহাসের তথ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে প্রামাণ্যতার বিচারে বইটি মূল্যহীন। বইটির "দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' নামটিও সঠিক নয়। অন্যত্র এক জায়গায় বইটির নাম পাওয়া যায় "Dinngawadi Ayedapawn", মোটামুটি অর্থ করলে দাঁড়ায় ধন্যবতী রাজ্যের কাহিনী'। আরাকানের সরকারী নাম ছিল ধন্যবতী। আরাকান রাজ্য ১৮২৬ সালে ইংরাজ অধিকারে আসার কাল পর্যন্ত আরাকানের সরকারী নথিপত্রেও দেশের জন্য এই নামই ব্যবহৃত হতো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে চাকমা ইতিহাসের সূত্র হিসাবে চুইজং ক্যথং ও দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং বই দুইটির প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই রাজা ভুবন মোহন রায়ের ২৮শে আগষ্ট ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত একটি নোটে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বই দুইটির প্রথম আবিষ্কারক সতীশ চন্দ্র ঘোষ না ভুবন মোহন রায় সে কথা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে সতীশ চন্দ্র ঘোষের বইটি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হলেও বইটি তিনি প্রেসে দেন তারও বছর দুই পূর্বে, অতএব বইটি অনেক আগেই তিনি হাতে পান।

ফেইরী প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের বিবরণে দেঙ্গ্যাওয়াদি বর্ণিত ঘটনাগুলি, বিশেষতঃ তথাকথিত চাকমা রাজ ইয়াংজ এর বিরুদ্ধে আরাকানাধিপতি মেথদির বিশাল অভিযানের বিবরণ নেই। ইতিহাস পুস্তিকা হিসাবে দেঙ্গ্যাওয়াদির মূল্য সংশয়জনক। পুস্তিকা অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়াবলির কথা জানিনা, কিন্তু সাক বা সতীশ ঘোষের মতে চাকমা জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে 'চাকমা জাতি' গ্রন্থের সূত্রে যে বিবরণাদি পাই সেগুলি পর্যালোচনা করলে তথ্যাদির প্রামাণ্যতা এবং বইটি'র মূল্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ জাগে। আমার মনে হয় আমাদের দেশে গ্রাম্য কবিগণের রচিত কল্প কথা সমৃদ্ধ পুঁথির ন্যায় এটিও একটি নিম্নমানের পুঁথি বিশেষ। কোন কালে এটি হয়ত বটতলার পুঁথির ন্যায় ছাপাও হয়ে থাকতে পারে, যে কারণে সতীশ ঘোষের পক্ষে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে পুঁথি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়। আমার ধারণা যে পুঁথিটি ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাস রচনার প্রকাশের অনেক পরবর্তী কালে ইতিহাসে অনভিজ্ঞ কোন উৎসাহী গ্রাম্য রচয়িতা কর্তৃক রচিত।

এই পুঁথিটিতে পরিবেশিত চাকমা জাতি সংক্রান্ত তথ্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ কেবল এটি নয়। সন্দেহ করার অপর একটি প্রধান কারণ উক্ত পুঁথিতে ব্যবহৃত "ছাক" শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে যে শব্দটিকে ভিত্তি করে সতীশ ঘোষ চাকমা জাতির ইতিহাস ব্রহ্ম দেশীয় ইতিহাস জুড়ে দেন। মনে রাখতে হবে যে দেঙ্গ্যাওয়াদির রচয়িতা "ছাক" জাতির কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কোথাও বলেননি যে ছাক ও চাকমা জাতি এক এবং অভিন্ন। সতীশ চন্দ্র ঘোষই

তাঁর 'চাকমা জাতি' পুস্তকে প্রথম এই ধারণা প্রকাশ করেন যে ছাক ও চাকমা জাতি এক এবং অভিন্ন। অতএব দেঙ্গ্যাওয়াদি বর্ণিত ছাক জাতির ইতিহাসই চাকমা জাতির ইতিহাস। যে সমস্ত লেখক এ জাতীয় মতের পোষকতা করেন তাঁরা সকলেই সতীশ ঘোষের পরবর্তী কালের। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁদের মত এই মতেরই জনক সতীশ চন্দ্র ঘোষের নিকট থেকে ধার করা। 'ছাক' শব্দ যে সর্বদাই চাকমা বোঝায়না এবং শব্দটি যে অনেক পন্ডিতেরও মাথা গুলিয়ে ফেলেছে সে সম্পর্কীত আলোচনা পরে হবে। এখন সতীশ চন্দ্র ঘোষ যে নিজেও এই ছাক শব্দটি নিয়ে ভ্রমে পড়ে দেঙ্গ্যাওয়াদি বর্ণিত ছাক ইতিহাসকে বিনা পরীক্ষায় চাকমা ইতিহাস বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন নিচের আলোচনায় সে বিষয় পরিস্ফুট হবে। এইবার সতীশ ঘোষের বিবরণানুযায়ী দেঙ্গ্যাওয়াদিতে বর্ণিত কাহিনীর সংগে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম ইতিহাসের কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকার গণের মধ্যে Sir Arthur Phayre-ই–সর্ব প্রথম ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাসের সামগ্রিক পর্যালোচনা করেন। ১৮৮৩ সালে তাঁর "History of Burma" পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। সতীশ চন্দ্র ঘোষ নিজেও বইটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু মনে হয় তিনি কখনও সেটি পড়ে দেখেননি। বইটি পড়া থাকলে দেঙ্গ্যাওয়াদি সুত্রে গৃহীত চাকমা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে হয়তো তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হতো বলে মনে হয়। তিনি অবশ্য তাঁর বইতে Phayre-র আরাকান ইতিহাস সম্পর্কীত অন্যান্য নিবন্ধাদি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন সে কারনে এখানেও প্রধানতঃ Phayre-র ব্রহ্ম ইতিহাসে প্রদত্ত তথ্যগুলির সংগে সতীশ ঘোষ প্রদত্ত তথ্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

পুগানরাজ আলংছিসুর বিরুদ্ধে চাকমাগণের যুদ্ধ

সতীশ ঘোষের প্রদত্ত দেঙ্গ্যাওয়াদির বিবরণে আছে "এ সময়ে পেঁগো (আধুনিক পেগু) [১০] দেশে আলং চিছু নামক জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙ্গালীদের

১০· পেঁগোকে সতীশ বাবু আধুনিক পেগু মনে করে বন্ধনীর মধ্যে সে কথা উল্লেখের কারণ। আলং ছিসু ছিলেন আসলে 'পুগানে'র রাজা। পুগান আর পেগু এক নয়। ইরাবতী তীরবর্তী পুগান ছিল উচ্চ ব্রহ্মে, আর আধুনিক পেগু নিম্নব্রহ্মে।

সহিত মিলিয়া চাকমাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করে। পেঁগো রাজ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী (কোরেংগ্রী) কে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, একটি সারসপক্ষী একখানি মৃত প্রাণীর চর্ম মুখে লইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সারস বাঙ্গালী ও চর্মখানি চাকমা উভয়ের মিত্রতা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ও চাকমাগণ এই সারসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিবে। রাজা মন্ত্রীর এহেন যুক্তি-গর্ভ আশ্বাস বাক্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে একটি হস্তী উপহার প্রদান করেন। অনন্তর হঠাৎ চর্তুদ্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল পবিত্র মহামুনি মূর্তি স্বেদসিক্ত হইলেন। ঘন ঘন অশনিপাত অকালবৃষ্টি বন্যায় সমন্তাৎ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই অমঙ্গল শান্তির নিমিত্ত পুরোহিতকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন।" (সতীশ চন্দ্র ঘোষ; চাক্‌মা জাতি ১৯০৯ পৃঃ ১৮)। আলংছিসু ছিলেন পুগান রাজ ক্যান্‌জিথার পৌত্র এবং ব্রহ্ম ইতিহাসের স্বনামধন্য রাজা 'আনোরাতা'র প্রপৌত্র। ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে আলংছিসুর শাসনামলে দেঙ্গ্যাওয়াদি বর্ণিত ঐ জাতীয় কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। বরং দেখা যায় তিনি এক লক্ষ পিউ এবং এক লক্ষ তলইং, এই দু'লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আরাকানের রাজ্যচ্যুত রাজা Letya megnan কে আরাকান সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যনজিথার সময়ে Meng Bilu কর্তৃক বিতাড়িত আরাকানের ভাবী রাজা Mengre baya পুগান রাজা দরবারে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি ২৫ বছর কাটান। আলংছিসু তাঁর ছেলে Letya megnan কে পুনরায় আরাকান সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বেই পুগান রাজ আনোরাতা আরাকান সহ বঙ্গদেশ (সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চল) জয় করেন। আলংছিসুর আমলেও বঙ্গদেশ পুগানের কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং "He visited his western province of his dominion through Arakan to the adjoing part of Bengal" (Phayre: Histroy of Burma, 1883, Page-39) এই অবস্থায় চাকমাদের পক্ষে শক্তিমান আলংছিসুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কল্পনা অবাস্তব। উপরের উদ্ধৃতিতে যুদ্ধস্থল কোথায় ছিল কিংবা দেঙ্গ্যাওয়াদিতে বর্ণিত এই ঘটনায় শান জাতিরই কিছু ইঙ্গিত আছে বলে মনে করা যায়। সে সময় ছাক বা চাকমাদের অবস্থান কোথায় ছিল তা' নির্দেশ করা হয়নি। যদি তাদের অবস্থান আরাকান-চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোথাও হয়ে থাকে তবে আরাকান পার হয়ে তাদের

পক্ষে এতদূরে উচ্চ ব্রহ্ম অবস্থিত শক্তিশালী পুগানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্ভব নয়; বিশেষতঃ খাস আরাকানই যখন আলংছিসুর শাসনাধীন ছিল। আর যদি উচ্চ ব্রহ্মে হয়ে থাকে তবে 'বাঙ্গালী'দের সহিত মিলিয়া' আলংছিসুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করা কল্পনা কষ্টকর। অতএব বর্ণিত ঘটনাটি নিছক কল্পনা প্রসূত বলে ধরে নেওয়া যায়।

ব্রহ্ম দেশের ইতিবৃত্তকার G. E. Harvey -র একটি বিবরণে ছাকরাজ Kadon এর সংগে আলংছিসুর শত্রুতার উল্লেখ আছে,- "Hmannan Yazawin (মহারাজ ওয়েৎ) does not locate Alanngsithu's enemy "Kadon, ruler of the thet" but if he was really west of Arakan Yoma and some suppose, ruling seven hill tracts in the south as king of Sandoway, it would account for the city's name as a repetition of the kadu capital Taghaung's other name Sandoway. His own name reeurs in the Mro and Hkami people in the Saingdin area; they say it was once ruled by Nga Maung kadon, a giant who created the Saingdin waterfall, 7 miles east of Buthidong. This gaint may be Phayre's Nga-Meng-ngatun, an 11th Century prince who was reared among the thet (himself of thet descent ?) in or near saingdin, built a strong hold at Thabeik taung 5 miles south of Buthidaung, won the throne of vesali 6 miles north of Mrauk-u (Which has been temporarily held by a Mro), moved it to Pyinsa-Sambawut. On the other bank of the Lemro 4 miles east of Mrauk-U, and died fighting a presh Influx of Pyus or Burmans; Pyinsa, the name he gave Sambawut, recalls

pyinsala on the other bank of the Irrawadi just below Tagaung and the name of his successor (in Paton's list) in kadu San." (Harvey: Bayinnaung's living Descendent, Journal of the Burma Reseach Society 44 (1)।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে ধারণা করা কঠিন নয় যে এই Sak বা Thet নামে পরিচয় দিয়ে দেঙ্গ্যাওয়াদি বা অন্যান্য কাহিনীতে বার বার যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা আসলে উচ্চ ব্রহ্মের কাদু শান গোত্রের লোক, যাদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে 'চাক' উপজাতি নামে পরিচিত। Harvey এর উপরোক্ত বিররণ অনুযায়ী কারও কারও মতে সাক রাজা Kadon এর রাজধানী Sandoway উচ্চ ব্রহ্মের কাদু রাজধানী Tagaung এরই অপর নাম। রাজা ওয়েং এর সূত্রে সতীশ ঘোষ বর্ণিত Nga Meng nga- tim কে (সতীশ ঘোষের ন্যা–সিং–ন্যা তুং) সাক বা Thet বংশীয় বলে Harvey-র অনুমান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী Pyinsa নামের সংগে কাদু রাজধানী Tagaung এর নিকটে Pyinsala–র নাম ইত্যাদিও ইঙ্গিত করে যে দেঙ্গ্যাওয়াদি সহ অন্যান্য ব্রহ্ম ইতিহাসে উল্লেখিত এই সাকরা (সতীশ ঘোষের মতে 'ছাক') উচ্চ ব্রহ্মের কাদু শান গোত্রের লোক; সতীশ ঘোষের ধারণা অনুযায়ী চাকমা নয়।

ব্রহ্মরাজ আলম প্রা'র বাঙ্গালী বিজয়

দেঙ্গ্যাওয়াদি থেকে সংকলিত সতীশ ঘোষের পরবর্তী বিবরণ এই রূপ–" এই ঘটনার বহুকাল পর আনালুফা নামে জনৈক পেগু রাজার শাসন সময়ে পুনরায় বাঙ্গালী ও চাকমাগণ মিলিয়া উত্থিত হয়। রাজা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া দাম্বাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। দাম্বাজিয়া যাত্রা করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, একটি বক ও একটি কাক ঝগড়া করিতেছে, অবশেষে বক কাকের ডানা ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি রাজার নিকট আসিয়া তাহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, এই কাক বাঙ্গালী এবং বক আমরা। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, এই যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত। সেনাপতি অমিত উৎসাহে যুদ্ধারাম্ভ করিলেন। পাঁচদিন অবিরাম যুদ্ধের পর বাঙালী ও চাকমারা পলায়ন করে" (চাকমা জাতি–পৃঃ ১১)। আগের কাহিনীতে এবং এখানেও যেভাবে অতিপ্রাকৃত

ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিক মনে করাই অযৌক্তিক। এই 'আনালুফা' কে ? ঘটনার কোন সন তারিখ দেওয়া হয়নি। ব্রহ্ম-ইতিহাসে আলংছিসুর পরে সুবিখ্যাত 'আলম প্রা' ব্যতীত 'আনালুফা' বা ঐ জাতীয় নামের কাছাকাছি আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। উপরোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত আনালুফা যদি ব্রহ্ম রাজ আলম প্রা' হন-যিনি ধুমকেতুর ন্যায় আকস্মিকভাবে উদিত হয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিজের করললগত করেন- তবে ইতিহাসে এর অপেক্ষা কালানুক্রমিকতায় ত্রুটি আর কল্পনা করা যায় না। কারণ আলম্ প্রা'র উত্থান ও পতনের কাল ১৭৫২-১৭৬০ খৃষ্ঠাব্দ; সে সময়ে চাকমা রাজা সহ চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং তাদের তৎকালীন ইতিহাস সর্বত্র ....। কাজেই এই ঘটনার সম্পর্কে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দেঙ্গ্যাওয়াদি বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাকে প্রচলিত ব্রহ্ম-আরাকান ইতিহাসের সংগে কোন মতেই খাপ খাওয়ান যায় না। অতএব সেই ঘটনা একটি নিতান্ত কল্পিত কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

মাতামুহুরী মোহনার যুদ্ধ

দেঙ্গ্যাওয়াদির পরবর্তী কাহিনী নিম্নরূপ, "অনন্তর কুতুবদিয়ার উত্তরে বাঙ্গালীগণ এবং আরাকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেন পাহাড়ের চাকমাগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আরাকান রাজার দুই মন্ত্রী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালী ও চাকমাগণ যাহাতে মিশিতে না পারে তজ্জন্য আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। বাঙ্গালীগণকে জয় করিতে পারিলে চাকমাগণকে বশে আনিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীরা বেগতিক দেখিলেই পলাইয়া যায় এবং প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। সুতরাং যে রূপে তাহাদের সমূহ বল বিধ্বস্থ হয় সেই কৌশল খেলিতে হইবে। এই নিমিত্ত পঞ্চ সহস্র-বালাম নৌকা প্রস্তরপূর্ণ করিয়া একদা নিশাভাগে বাঙ্গালীদের জাহাজাদি চলিবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। বর্তমান মাতামুড়ি নদীর মোহনায় চান্দাজা ও মুখ্যংজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য থাকে। অন্যদিকে প্রকান্ড বংশ ভেলায় বারুদ, গোলা এবং বহু সংখ্যক সৈন্য পুত্তলিকা স্থাপন করিয়া ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীরা মনে করিল, ঐ বুঝি মঘ সৈন্য আসিতেছে। তাহারা অনতিবিলম্বে জাহাজে চড়িয়া গোলা বর্ষণে তৎপর হইল। ভেলা যতই নিকটতর হইতেছিল, তাহারা আরও অধিকরূপে গোলা ক্ষেপন করিতে লাগিল। পরিশেষে এই গোলার অগ্নিতেই ভেলাস্থিত বারুদ গোলাদি জ্বলিয়া স্বসৈন্যে বাঙ্গালীদিগের জাহাজ বিনষ্ট

হইয়া গেল। এই রূপে অতিসহজেই বাঙ্গালী বিজয় হইয়া গেল। পক্ষান্তরে চাকমারাজ উপায়ন্তর না দেখিয়া মঘরাজার অধীনতা স্বীকার পূর্বক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী মঘ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, চাকমা রাজার সহিত সখ্য স্থাপনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালীদিগের কুটবুদ্ধিতেই চাকমা রাজ ভ্রমে পড়িয়া ছিলেন। (সতীশ ঘোষ; চাকমা জাতি, পৃঃ ১৯–২০)।

ঘটনাটির কোন কাল উল্লেখ করা না হলেও পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বাদশ এবং পরবর্তী ঘটনা চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্ণিত হওয়া এই ঘটনা তার মাঝামাঝি সময়ের অর্থাৎ মোটামুটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে ধরে নেওয়া যায়। ঘটনাটিও প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী বিজয়ের এবং ঘটনাস্থলটিও বর্তমানে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার অন্তর্গত (যদিও সম্ভবতঃ ঐ স্থলটি তৎকালে আরাকানের রাজ্য সীমায় অন্তর্গত ছিল) ঘটনার মুলে কিছুমাত্র সত্য থাকলে বাঙ্গালী ইতিহাসবিদগণের কাছে এটি একেবারেই অবিদিত থাকার কথা নয়। তা'ছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'বারুদ গোলার' ব্যবহার এবং জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণের বিবরণ ঐতিহাসিকভাবে সত্য হতে পারে না। কারণ আসলে শুধু এ অঞ্চলে নয় পৃথিবীর কোথাও বারুদ গোলা ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। ইতিহাসবিদগণ বলেন উপমহাদেশে মোগল সম্রাট বাবরই ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের পানি পথের যুদ্ধে সর্ব প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। সেই সময়ের তিন শতাব্দীর পূর্বে আরাকানবাসীদের দ্বারা বারুদ গোলা ব্যবহারের সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি ঘটনার সংগেই বাঙ্গালীদের জড়িত করা হয়েছে এবং বিবরণে চাকমাদের তুলনায় বাঙ্গালীদের প্রতিই যেন লেখকের আক্রোশ বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। এই মনোভাবের পেছনে একটি কারণ থাকতে পারে। প্রতিপক্ষ হিসাবে চাকমাদের তুলনায় বাঙ্গালীরা বেশী শক্তিশালী এই কারণেই কী পরবর্তী কাহিনীগুলিসহ 'চাকমা জাতিতে' অন্তর্ভূক্ত দেঙ্গ্যাওয়াদি'র সমুদয় কাহিনীর বিবরণ পাঠ করলে দেখা যায় প্রতিপক্ষের সংগে সংঘর্ষে সর্বদাই আরাকান রাজের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। মনে হয় আরাকানী গ্রন্থকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেক অলীক আজগুবি কাহিনীর অবতারণা করে এমনকি প্রয়োজনবোধে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে হলেও প্রতিপক্ষকে হেয় করে নিজ পক্ষের গৌরব প্রদর্শনের প্রয়াস নিয়েছেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষও এ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন– "আরাকানাধিশ্বরের দিগ্বিজয় বর্ণনায় ইহা নানা দেশের তথ্যে তথ্যপূর্ণ আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সংগে দুই একস্থলে ইহার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তদীয় সাক্ষ্য কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নাই। এই সভ্যতার প্রদীপালোকেও ঐতিহাসিকের নিকট নিরপেক্ষ বর্ণনা চাহিবার আশা বড় অল্প; একই দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন চশমায়

বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, হায় হতভাগ্য পাঠক দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত, পড়িতে পড়িতে উদভ্রান্ত এবং ভাবিতে ভাবিতে বিভ্রান্ত হইয়া রহে"। দেঙ্গ্যাওয়াদির গ্রন্থকার যে আরাকানাধিশ্বরের দিগ্বিজয় বর্ণনার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ রঙের 'চশমা' পরে এই কাল্পনিক ঘটনাগুলি নিরীক্ষণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। সতীশ চন্দ্র ঘোষ যে নিজেও সেই বিবরণগুলি পাঠ করে 'ভ্রান্ত' উদভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত' হননি সে কথা বলা যায় না।

রাজা ইয়াংজ বা অরুণযুগ ও মইচাগিরির পতন

অতঃপর সতীশ চন্দ্র ঘোষ দেঙ্গ্যাওয়াদিতে বর্ণিত আরাকান রাজ 'মেংদি' কর্তৃক উচ্চ ব্রহ্মের (আসলে মধ্য ব্রহ্মের) তথাকথিত চাকমা রাজ ইয়াংজ এর রাজধানী মইচাগিরি আক্রমণের বিবরণ দেন। এই বিবরণ দীর্ঘ; কিন্তু পাঠকদের পক্ষে বক্তব্য অনুসরণের বিঘ্ন হবে বিদায় "চাক্‌মা জাতিতে বর্ণিত পূরা বিবরণটিই এখানে তুলে দেওয়া গেল---------"৬৯৫ মঘাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ) আরাকানাধিপতি মেংগদি সমীপে লামূনছুগ্রীনামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চ ব্রহ্মের চাকমা রাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী (কারেংগ্রী) রাজাংগ্যা ছাংগ্রাইর অধীনে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া চাকমা রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পরে রিজার্ভ হইতে আরও বিংশ সহস্র সৈন্য তাহার সাহায্যার্থে দিলেন। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তংথংজার শাসন কর্তা হিংজচুর অধীনে দশ হাজার এবং তংগুর শাসনকর্তা রেমাচুর সংগে দশ হাজার সৈন্য দিয়া মংক্রমের পথে,--------------- শাসনকর্তা ছাদোয়ং এর তত্ত্বাবধানে দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছাব্রংকামার পথে, দালাকের শাসনকর্তা ক্যচুঙের সহিত দশ হাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে,----------নামক শাসনকর্তাকে দশ হাজার সৈন্য দিয়া রচ্চারুইর পথে, মাইয়ং এর শাসনকর্তা থেচুকে দশ হাজার এবং চিথোংজার শাসনকর্তা লাচুই এর অধীনে দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছালোক্যার জল পথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এই রূপ প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

"এতদ্ভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংথংজার শাসনকর্তার নিকট পেঁগো রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে 'আমরা যুদ্ধ করিতে আসি

নাই । মঘরাজ মিত্রতা স্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা সুন্দরী রমনী উপহার লইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন’ । পরে তোমরা স্ত্রীলোকটিকে সুসজ্জিত করিয়া দেখাইও । দালার পথযাত্রী ক্যচুংকেও এই রূপে শ্যামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল । বলা বাহুল্য তাঁহাদের সংগে এক একটি সুন্দরী রমনীও দিয়াছিলেন । অনন্তর মন্ত্রী প্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাকমা রাজার রাজধানী (উচ্চব্রহ্মে) মইচাগিরি আক্রমণ করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্নব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবে । যখন যাহা ঘটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয় ।

মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাপ্রু নগরে উপস্থিত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্রসহ চাকমা রাজার দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন । পত্রে উল্লেখিত হইল, মঘরাজা এক পরমাসুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন । চান্দাই নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিলেন । চাকমা রাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটি হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, এক খানি সুবর্ণ যাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণমন্ডিত রেকাব ও জিন এবং একটি সোনার থোকদান পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচ্‌মীকে পাঠাইলেন । ব্রাচ্‌মী আসিতেছেন শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্যবাহিনী পোচন্দা ও পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন । নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন । ব্রাচ্‌মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমনী প্রদর্শিত হইল । অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র দিয়া ব্রাচমীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্‌মী প্রত্যাবৃত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাই এর (কূটনীতি প্রসূত) পরিচয়ানুসারে যুবতীকে মঘরাজ মেংদির সহোদরা বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন । পরিচয় শুনিয়া চাকমা রাজা আরও আহ্লাদিত হন এবং সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে রাজ-সহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক লোক পাঠাইলেন । মন্ত্রী এই রমনীর সহিত একশত হস্তীও চাকমা রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিতে ঢাকার শাসনকর্তা রেয়ংকে দশ হাজার সৈন্য লইয়া সংগে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু রেয়ংকে গোপণে বলিয়া দিলেন, চাকমা রাজা নৃত্য গীতাদি অতিশয় ভালাবাসেন, মদ্যসেবীর অপরদিকে দৃষ্টি থাকে না; সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপনি সুবিধা করিয়া লইবেন । পরে কাঁইচার শাসনকর্তা ওয়ান্টবোর সংগেও দশ সহস্র সৈন্য দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন ।

“এদিকে রজনী সমাগমে চাকমা রাজ ইয়াংজ অনললুব্ধ পতঙ্গ প্রায় প্রমোদ

নিকেতনে নৃত্য গীতাদিক প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয় করে সমর্পন করিলেন। রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত যুবতীকে পাশ্ববর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দিকে আক্রমণ করেন। ওয়ান্টবোও পশ্চাদভাগের জংগল পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাংগ্রাই এই রূপে দলে দলে ক্রমশঃ অপর সমুদয় সৈন্য পাঠাইয়া পরিশেষে দলবলসহ স্বয়ং যোগদান করিলেন। এখানে তাঁহাদিগকে কোন যুদ্ধক্লেশ পাইতে হয় নাই। অতিসহজেই চাকমা রাজ ইয়াংজ এবং মধ্যমপুত্র চোফ্রু ও কনিষ্ঠ পুত্র চৌতুকে বন্দী করিয়া মইচাগিরির পর্বতাকীর্ণ নগর মধ্যবর্তী রাজ প্রাসাদ অবরোধ করেন। সেখানেও বিনাক্লেশে যুবরাজ চজুং, রাণী তিনজন, দুই রাজকন্যা এবং দাস–দাসীগণকে বন্দী করিলেন। অতঃপর মন্ত্রী প্রবর ছাইংগ্রাই ৬৯৫ মঘাব্দের (বাংলা ৭৪০ সাল) ২রা মাঘ চাকমা রাজা এবং তদীয় তিনরাণী, তিনপুত্র, দুই কন্যা ও দাস–দাসীদিগের সহিত রেয়ংকে মঘরাজ মেংগাদি সমীপে পাঠাইয়া দেন। এই রূপে চাকমা রাজ্য অতি সহজেই মঘরাজার করতলগত হইল। অবশেষে ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ–রৌপ্য এবং দশ সহস্র চাকমা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

"মন্ত্রীবর রাজাংগ্যা ছাংগ্রাইর কর্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ঠ হইয়া আরাকানাধিপতি মেংগদি তাঁহাকে "মাহা উছা ওয়ান্না" অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব ও একখানি স্বর্ণমন্ডিত পাল্কী উপহার প্রদান করেন এবং হস্তীর উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র অংজাউর সংগে চাকমা রাজার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা চমি খাঁকে মেংগদি নিজেই রাখিয়া দেন। অনন্তর চাকমা রাজ ইয়াংজকে আরাকানের অন্তঃপাতী ক্যমুছা নামক স্থানের কাফ্যা জাতির আধিপত্য অর্পণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চজুং ও মধ্যমপুত্র চোফ্রুর হস্তে যথাক্রমে কিউদেজা ও মি ------- রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র চৌতুকে------------ নামক স্থানের জলকর তহশীলদার দিয়া নিকটে রাখেন। চাকমা রাজপুত্র তিনজনেই মঘরাজার বিশেষ তত্ত্বাবধানে রহিলেন। অপর দশ সহস্র চাকমা প্রজাকে এংখ্যাং এবং ইয়ংখ্যাং নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সংগে সংগে তাহাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তিত করিয়া দৈংনাক আখ্যা প্রদান করিলেন।

"এতাদৃশী অধীনতায় জীবনযাপন রাজপুত্রত্রয়ের ক্রমেই অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭০৫ মঘাব্দে (১৩৪/৪৪ খৃঃ অঃ) মেংগাদি লিমূক্রু যাত্রা করিলে

তাঁহারা তিন ভ্রাতাই একত্র যোগে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চ ব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। মঘ রাজা ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চ বাক্য করিলেন না। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চজুং ভূতপূর্ববশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাপ্রু নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম ভ্রাতা চৌফ্রু ক্যজম রাজার নিকট হইতে "মংরেনো" খেতাব এবং প্রুম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চৌতু চাখ্যম নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘিতে (১৩৬২-৬৩ খৃঃ) "তারদ্যা" উপাধি ও আমায়ু দেশের শাসনভার লাভ করেন।" (চাকমা জাতিঃ সতীশ ঘোষ, পৃঃ ২০-২৩)।

উপরের বিবরণে তথাকথিত চাকমা রাজা ইয়াংজ বা অরুণযুগের পতন কাহিনী বড় করুণ। এতবড় শক্তিধর রাজা এবং একটি সমৃদ্ধ জাতির এই পরিণতি-তাও আবার ছলনার মাধ্যমে; যার সংগে কিনা আরাকান রাজ দুই লক্ষ সৈন্য দিয়েও সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখী হতে সাহস পাননি-অত্যন্ত দুঃখাবহ সন্দেহ নেই। চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণ এ কারণে এ ঘটনাকে বেশ ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে দেঙ্গ্যাওয়াদির কাহিনীকার এই ঘটনার সংগে আগেরগুলির ন্যায় অতি প্রাকৃত ঘটনার বিবরণ যোগ করে এটিকে কল্প কথায় পর্যবসিত করেননি। কিছু অতিরঞ্জন এবং অলঙ্কারের আতিশয্য স্বত্ত্বেও এই ঘটনার বিবরণ আগেরগুলির তুলনায় অনেক বাস্তব সম্মত কিন্তু এতবড় একটি মহীরুহের পতন যা প্রচন্ড শব্দে চারিপাশের বনভূমিকে প্রকম্পিত করে তোলার কথা, অথচ আশ্চর্যের বিষয় ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে এই ঘটনার কোন ছায়ামাত্র পড়েনি।

সে সময়ের আরাকান ইতিহাস ফেইরী এই ভাবে বর্ণনা করেনঃ- "Arakan became subordinate to Pugan monarchy when letyamegnan was placed on the throne of his ancestors. He fixed his capital at Parin. The Country enjoyed rest for a long period, and there is nothing in the annals worthy of remark until after the centure of Pugan by the Mougals. In the early part of the fouteenth century mention is made of invasion by the Shans, which apparently refers to attacks by kings of Myinsaing and Panya" (Phayre: History ot Burma, P-76).

আরাকান ইতিহাসে মেংদির রাজত্বকাল ১২৭৯ খৃঃ থেকে ১৩৮৫ খৃঃ পর্যন্ত (অবিশ্বাস্যকরভাবে দীর্ঘ ১০৬ বৎসর)। এই মেংদির সময়েই উপরে দেঙ্গ্যাওয়াদির বর্ণিত ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের মইচাগিরি পতনের ঘটনা। কিন্তু ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে আরাকান রাজ মেংদি কর্তৃক সাক রাজ্য জয়ের কোন বিবরণ নেই বরং Myinsaing এর শান জাতি কর্তৃক উল্টো আক্রমণেরই উল্লেখ আছে। দু'টি পুস্তকে এই দু'ধরণের সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত ধর্মী বক্তব্য ধাঁধার সৃষ্টি করে। ফেইরীর এই সময়কার আরাকান ইতিহাসের বর্ণনা যেখানে "there is nothing in the annal worthy of remark" মন্তব্য করেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা হয়েছে; অধিকন্তু সান জাতি কর্তৃক আরাকান আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে দেঙ্গ্যাওয়াদির গ্রন্থকার কর্তৃক দু'লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ আরাকানাধিপতির উচ্চ ব্রহ্মের প্রবল পরাক্রান্ত তথাকথিত চাকমা রাজের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ বিজয়াভিযানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে এস্থলেও আরাকানী গ্রন্থকার তাঁর পূর্বোক্ত মানসিকতার বশে আসল ঘটনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে আরাকানী রাজার জয় গৌরব প্রচারের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

ফেইরীর বিবরণে দেখা যায় সে সময়ের কিছুকাল পূর্ব থেকে পুগান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ায় শানদের কর্তৃত্বে চলে যায়। শানগণ বর্তমান আভার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে Myinsaing এ এক নূতন রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকে। পুগানের নামে মাত্র রাজা Kyoaswa-র আমন্ত্রণে চীনের মঙ্গোল বাহিনী পুগান আক্রমণ করে (১৩০০ খৃঃ)। সে ঘটনা ঘটে চীনের বিখ্যাত মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁনের মৃত্যুর (১২৯৫ খৃঃ) বছর পাঁচেক পরে। মঙ্গোল বাহিনী অল্প কিছুকাল অবস্থানের পরে ফিরে যায়। সে ঘটনায় Kyoatswa-র অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং সানদেরই কিছু সুবিধা হয়। দেঙ্গ্যাওয়াদিতে সে সময়ে রাজা মেংদি কর্তৃক শাক রাজ্য জয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঠিক সে সময়ে Myinsaing এর সান রাজাগণের বংশ তালিকায় রাজা U-Za-Na বা Usana-র নাম পাওয়া যায়, যিনি ৬৮৪ মঘাব্দে বা ১৩২২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ অবধি বিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। দেঙ্গ্যাওয়াদির বর্ণিত বিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। দেঙ্গ্যাওয়াদির বর্ণিত তারিখ যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তবে উপরোক্ত ঘটনা তারই সময়ের। আমার বিশ্বাস দেঙ্গ্যাওয়াদির কাহিনীকার এই সানরাজ U-za-na কেই উচ্চ ব্রহ্মের সাকরাজ ইয়াংজ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় সান রাজ U-za-na এর

আসলে আরাকানের সংগে তাঁর সংঘর্ষের কাহিনীকে বিকৃত করে এবং তাতে প্রয়োজনীয় রঙ চড়িয়ে দেঙ্গ্যাওয়াদির কাহিনীকার একটি চমৎকার উপাখ্যান তৈরী করেন, আর সতীশ চন্দ্র ঘোষ সেই উপাখ্যানের সান বা সাকরাজ "উজানা"কে চাকমা রাজ 'ইয়াংজ' এবং তাঁর রাজধানী 'মৈইনসাইং'কে 'মইচাগিরি' বানিয়ে একটি অভিনব চাকমা ইতিহাস তৈরী করেছেন। উল্লেখ্য যে U-za-na–র পিতার নাম ছিল Thihatu, এক ভাইয়ের নাম Tsanywon, দ্বিতীয় ভাইয়ের নাম Tarabya, অপর এক ভাইয়ের নাম Kyan-tswa. মনে হয় উপাখ্যানে এই Thihatu কেই রাজপুত্র চৌতু এবং Tsan-ywon কে চজুং বানানো হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে Tarabya-র রাজধানীর নাম ছিল Sagaing। 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে মইচাগিরির পতনের পর রাজপুত্র চৌতুকে 'তারদ্যা' খেতাব দিয়ে চাখ্যং রাজ্যের শাসনভার দেওয়া হয়। ধারণা করা কঠিন নয় যে এই 'তারদ্যা' আসলে Tarabya এবং চাখ্যং রাজ্য আসলে Sagaing। দেঙ্গ্যাওয়াদির বিবরণে মধ্যম রাজপুত্র চৌফুকে যে 'ক্যজম' রাজার নিকট থেকে 'মংরেনো' খেতাব লাভের কথা বলা হয়েছে সেই 'ক্যজম' রাজাও সম্ভবতঃ কোন এক Kyoatswa। সে সময়ের সান এবং পুগান রাজাগণের বংশ তালিকাও বেশ জটিল Kyoatswu, Thihatu, Tarabya প্রভৃতি নামে বেশ কয়েকজন রাজ এবং রাজপুত্রের নাম পাওয়া যায়। (সেগুলি সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্য, কাইজার, জর্জ, ফিলিপ প্রভৃতির ন্যায় উপাধি বিশেষ অথবা রাজকীয় নাম)।

প্রাচীন ইতিহাসের বিবরণে এবং এ সমস্ত নামের জটিলতার মধ্যে দেঙ্গ্যাওয়াদির ইতিহাস অনভিজ্ঞ কাহিনীকারের পক্ষে সবকিছু তাল গোল পাকিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। বিশ্বাস, সতীশ চন্দ্র ঘোষও এই সব বর্মী নামের ধাঁধায় পড়ে সান রাজ UZANA কে চাকমা রাজ ইয়াংজ, সান রাজধানী Myinsaing কে চাকমা রাজধানী মইচাগিরি Tsanywon কে রাজপুত্র চজুং Thihatu কে চৌতু, Tarabya কে 'তারদ্যা', Kyoatswa কে ক্যজম, Sagaing রাজ্যকে চাখ্যং প্রভৃতিতে পরিণতঃ করেছেন (১১)। সে সময়

১১· এই সমস্ত বর্মী নামগুলির বাংলায় প্রকৃত উচ্চারণ এবং বানান কি হবে বলা কঠিন। সে কারণে Phayre এর History of Burma পুস্তকে সেভাবে ইংরাজীতে বানানগুলি দেওয়া হয়েছে। এখানেও সেভাবে ইংরাজীতেই দেওয়া হয়েছে। পূরা বিবরণের জন্য উক্ত–বইয়ের পৃঃ ৫৭–৬৪ দ্রষ্টব্য।

আবার Tagaung এর উত্তরে উচ্চব্রহ্মে সানদের আর এক রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল Mogaung. মনে হয় দেঙ্গ্যা ওয়াদি তথা সতীশ ঘোষের বিবরণে এই Mogaung কে পরবর্তী চাকমা রাজ্যের রাজধানী মংজা ফ্রু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। দেঙ্গ্যাওয়াদির বর্ণিত এই কাহিনী যে আসলে উচ্চ ব্রহ্মের অন্য এক জাতির কাহিনী যা চাকমা জাতির ইতিহাস বলে এ পর্যন্ত চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে বোধ করি সন্দেহ করার কারণ নেই। দেঙ্গ্যাওয়াদি তথা "চাকমা জাতিতে" উক্ত ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি দাবীকৃত ইতিহাসের সংগে খাপ খাওয়ান কঠিন হয়ে পড়ায় পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে পরবর্তী ইতিবৃত্তকারগণ সেই বর্মী নামগুলিকে সংস্কার করে ইয়াংজকে অরুণযুগ, চজুংকে সূর্যজিৎ, চৌতুকে শক্রজিৎ, মইচাগিরিকে মনিজগিরি ইত্যাদি এবং সর্বশেষে স্বর্গতঃ প্রাণহরি তালুকদার ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রী ব্রাচমীকে ব্রেজমুনিতে পরিণত করে চাকমা করণের প্রয়াস নেন এবং এভাবে অপর এক জাতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নিজের বলে আত্মস্থ করে চাকমা জাতির ইতিহাস রচনার দায়িত্ব শেষ করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য ইতিহাসের এই বিরাট অসংগতির দিকে এতদিন দৃষ্টি দেয়া হয়নি এবং সতীশ ঘোষের চাকমা জাতি প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি কাল পর্যন্ত একটি মিথ্যা ধারণাকে লালন করা হয়েছে। এই মিথ্যা ধারণা প্রসূত ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু আমাদেরকে নয় পাশ্চাত্য পন্ডিত এবং ইতিহাসবিদগণকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে চাকমা জাতিকে ব্রহ্ম আরাকান দেশোদ্‌ভূত বলে বদ্ধমূল ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত করার অবিরাম প্রয়াস এ যাবত চলে আসছে।

চাক জাতির ইতিহাস

এ প্রসঙ্গে চাক জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। আমাদের প্রতিবেশী চাকজাতি বান্দরবান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বাইছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলেখ্যং প্রভৃতি স্থানে বাস করে। তারা ধর্মে বৌদ্ধ। নিজেরা নিজেদের "আচাক" নামে পরিচয় দিলেও অন্যেরা তাদের চাক ও আরাকানীরা "সাক" বলে। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু বর্তমানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বহুলাংশে আরাকানী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। নিচে চাক ইতিহাসের সংশ্লিষ্ঠ অংশ দেওয়া গেল। পাঠকগণ লক্ষ্য রাখবেন এই বিবরণের সংগে প্রচলিত চাকমা জাতির ইতিহাসের উপরোল্লিখিত ঘটনাবলীর কোন পার্থক্য আছে কিনা।–"আরাকান রাজ মাং ভিলুর পুত্র রাজা মাংথির শাসনামলে চাক রাজার নাম ছিল য়েংচো। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল মিছাগিরি। মন্ত্রী কোরেংগ্রী লামুর শাসনকর্তার পরামর্শক্রমে এক অদ্ভুত উপায়ে মিছাগিরি আক্রমণের পরিকল্পনা

করেন। তিনি চারজন সেনাপতির নেতৃত্বে প্রত্যেকের সংগে এক একজন সুন্দরী যুবতীসহ সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন পথে মিছাগিরি পাঠালেন। এক দূত মারফত য়েংচোর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো যে রাজা মাংথি নিজ ভগ্নী ব্রাহ্মীকে উপহার দিতে চান। প্রস্তাবে খুশী হয়ে রাজা য়েংচো আরাকানী দূত সাং তাংকে প্রচুর অর্থ আর একটি হাতী উপহার দেন এবং বলেন যে, ৬৯৫ মঘীর তাপোথায় মাসের ১২ তারিখ (১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখ) তিনি ব্রাহ্মীকে গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট দিনে ১০,০০০ হাজার সৈন্য সহ রেঅং নামক আরাকানী সেনাপতি ব্রাহ্মীকে মিছাগিরি নিয়ে আসে। ব্রাহমীর রূপ দেখে য়েংচো মুগ্ধ হন। এদিকে মূল আরাকানী বাহিনী হঠাৎ রাত্রিতে রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং তার দুই পুত্র ও দুই কন্যার সাথে য়েংচো বন্দী হন। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র চোচুং তার অনুগত সৈন্যদের নিয়ে সূদূর ব্রহ্মদেশে পালিয়ে যান। আরাকান রাজ মাংথি রাজা য়েংচোকে ক্যখ্কা রাজ্যের শাসনভার, রাজকুমার চৌপ্রুকে মিঙ রাজ্যের শাসনভার, রাজকুমার চৌতুংকে কঙ রাজ্যের শাসনভার দেন এবং রাজ কুমারী চোমেখ্যানকে নিজে বিয়ে করেন। পরে চৌপ্রু বার্মায় পালিয়ে যান। চাকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে এবং তাদেরকে পূর্ববর্তী স্থান থেকে উঠিয়ে এঙ্ নদী, রো নদী প্রভৃতির তীরে বসবাস করার ব্যবস্থা হয়। এভাবে সুবিখ্যাত চাকরাজ্য ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দের দিকে ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ রাজপুত্র আনুমানিক ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন। অন্যান্য চাকরা তাকে অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে লামা মহকুমায় পৌছে। অনেকে তাঁর খোঁজ না পেয়ে আরাকান ফিরে যায়। (মং মং চাক; চাক উপজাতি পরিচিতি, সাময়িকী গিরিনির্ঝর ১ম সংখ্যা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি)। এই হলো চাকজাতির ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এবার পাঠকগণ চাকজাতির এই কাহিনীর সংগে সতীশ ঘোষ বর্ণিত চাকমা জাতির কাহিনী মিলিয়ে দেখুন। নামগুলির বা স্থান সমূহের বানানে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য ছাড়া উভয় কাহিনীই অবিকল এক *। কেবল সতীশ ঘোষের কাহিনীর ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রী ব্রাচমীকে এখানে রাজকুমারী ব্রাহ্মী বানানো হয়েছে এবং সতীশ ঘোষের কাহিনীতে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ মারেক্যজের চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসার তারিখটি চাকদের কাহিনীতে আনুমানিক ১৩৬৪খৃঃ ধরা হয়েছে। তাহলে দেখা যায় এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা

---

* সতীশ ঘোষের চাকমা রাজ ইয়াংজ–চাক ইতিহাসের য়েংচো, চাকমা রাজধানী মইচাগিরি–চাক ইতিহাসের মিছাগিরি–ইত্যাদি।

জাতির ইতিহাসের এই অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজের বলে দাবী করছে। এই কাহিনী কি চাকরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে ? না আমরাই তাদের কাহিনীকে আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি ? সন্দেহ নেই যে চাকরাও এই কাহিনী দেঙ্গ্যাওয়াদি বা অনুরূপ কোন পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছে। অতএব আমাদের নির্ণয় করা দরকার দেঙ্গ্যাওয়াদির কাহিনীকার সাক জাতির নাম আসলে কাদের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

চাকমা, চাক ও সাক পরিচয়

ব্রহ্ম আরাকানবাসীরা চাক ও চাকমা উভয় জাতিকেই "সাক" (ইংরেজী Sak, Tsak, Thek বা Thet) নাম অভিহিত করে। আরাকানী উদ্ভূত মার্মা বা মঘ সম্প্রদায় বলে সাঃ। শব্দটির বানান সাক বা ইংরেজীতে Sak লেখাহলেও শব্দটির আসল উচ্চারণ ব্রহ্ম আরাকান বাসীদের মুখেও সাঃ হয়, কারণ ব্রহ্ম আরাকানী ভাষায় শব্দের শেষে নাসিক্য ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্যান্য হলন্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় না। অতএব Sak বা সাক বা চাক শব্দের উচ্চারণ তাদের মুখে সাঃ হওয়াই স্বাভাবিক। ইংরেজী বর্ণমালায় যেহেতু বিসর্গ ধ্বনির জন্য কোন বর্ণ বা বর্ণ চিহ্ন নেই সুতরাং সাঃ ধ্বনিকে Sak লেখা ছাড়া বিকল্প নেই।
চাকমা ও চাক জাতি এক নয়। ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিচারে তারা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। অথচ একই শব্দ দ্বারা দু'টি পৃথক জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করায় এই শব্দটি নিয়ে একটি বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। জাতি পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা কেবল চাক ও চাকমাদের বেলায় সীমাবদ্ধ নয়, অন্যদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা বিদ্যমান। অধিকাংশের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের ম্রো এবং মুরুংদের পরিচয় পরিষ্কার নয় যদিও দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি তবুও অন্যরা উভয়কে মুরুং নামেই চিনে। কুকি নামে এ অঞ্চলে কোন জাতি নেই অথচ নানা পৃথক জনগোষ্ঠীকে একই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মঘ শব্দটি নিয়েও প্রচুর সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে মার্মা পরিচয়দানকারীদের, চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের এবং এককালে ইংরাজ কাগজ পত্রে চাকমাদেরও মঘ পরিচয় দান করা হয়। সাক শব্দ দ্বারা চাক ও চাকমা পরিচয় নির্ণয়ে বিভ্রাট আগেও হয়েছিল এখনও হয় অসাবধানতাবশতঃও হয় অজ্ঞতাবশতঃও হয়। যাই হোক আদিতে সাঃ শব্দ দ্বারা কাদের নির্দেশ করা হতো তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। ফেইরীর অনুমান এই শব্দ দ্বারা অতীত ভারতের শাক্য জাতির বর্মী শাখা ও তাদের বংশধরদের নির্দেশ করা হতো "..........................Only three

names have been handed down as borne by original tribes, or the first conjunction of such tribes that is kanran, Pyu or pru and Sak or Thek. The Last, however, is not an original native term, but probably and abbreviation of Sakya and may have been retained by at least a portion of the earliest Indian settlers and their descendants for some time," (Phayre; History of Burma, P. 5)

ফেইরীর আর এক বিবরণ অনুযায়ী এক সময় বারানসীর জনৈক রাজপুত্র বর্তমান Sandoway নগরের নিকট আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তী নগরে রাজত্ব করতেন-"এখানে তিনি পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আনয়ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সর্বাদৌ উপজীবিকা প্রার্থনা করে তিনি সেই সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন, "ছেক"। ইহারাই ক্রমে রাজকীয় ইতিবৃত্তে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৩৫৬ মঘাব্দে (৯৯৪-৯৫খৃঃ) রাজা ন্যা-সিং-ন্যা-তৈন এই ছেক বা ছাকদিগের সহযোগিতায় সিংহাসন লাভ করেন। (চাকমা জাতি, পৃঃ৮ Ref. J.A.S.B. No. 145, 1844) পরে অবশ্য ফেইরী নিজেই বারানসীর রাজপুত্রের এই কাহিনীর একটি বানোয়াট কাহিনী হিসাবে এর সত্যতা বাতিল করে দেন " The story of a king from Banaras is a fiction invented to connect the rulers of Arakan with the kings of that famous city" (Phayre: History of Burma, P-43)

সাধারণভাবে ব্রহ্ম-আরাকানবাসীরাও নিজেদের অতীতের শাক্য জাতি থেকে উদ্ভূত বলে দাবী করে। পরবর্তীকালে নিজেদের Mrymma, Mramma বা Brahma জাতি হিসাবে পরিচয় দিতে শুরু করার পর এই সাঃ বা সাক বলতে তারা কাদের বোঝাতো তা এখন নিশ্চিত করে নির্ণয় করা কঠিন। ব্রহ্ম আরাকানের প্রাচীন লোককাহিনী অনুসারে তাদের আদি পুরুষ শাক্যবংশীয় অভিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র কানরাজগ্যি আরাকানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে বংশ পরানুক্রমে রাজত্ব করেন। এই প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাস বরাবরই একটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত শাক্য জাতি বা (ফেইরীর ধারণা অনুসারে

শাক্য নামের সংক্ষিপ্ত রূপ) শাক বা সাক জাতির অস্থিত্ব কল্পনা করা হয়ে আসছে। এক সময় ব্রহ্মদেশ গভীরভাবে ভারতীয় আর্য (বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য) সংস্কৃতির প্রভাবাধীন ছিল। তাদের প্রাচীন নগরগুলির নাম যথা দ্বারক্ষেত্র, রামাবতী, ধন্যবতী, হংসবতী, রতনপুর ইত্যাদি এবং প্রাচীন রাজাগণের নাম এই সাক্ষ্য বহন করে। আরাকানেও দীর্ঘকাল চন্দ্রবংশ নামে (অনেকের ধারণা এরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত) একটি রাজবংশ বৈশালীতে (Wethali) রাজত্ব করে। কাজেই অতীতে একটি শাক্য বা 'সাক' জাতির অস্থিত্ব কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়। বাস্তবে হয়ত সুদূর অতীতে এরূপ ব্রহ্মজাতির সংগে নিঃশেষে মিশে গিয়ে তাদের ঠিকানা লুপ্ত হয়। এভাবে প্রাচীন সাকজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মবাসীরা বিশেষতঃ আরাকানবাসীরা সম্ভবতঃ তাদের প্রাচীন Legend এর ধারাকে অনুসরণ করে উত্তর দিক থেকে আগত যে কোন নবাগত বা অপরিচিত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীকেই সাক নামে অভিহিত করতো। এ কারণে প্রথমতঃ কাদুসানদের পরবর্তীকালে চাক, চাকমা, দৈন্‌নাক এমন কি ত্রিপুরাদেরকেও সাক নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নবাগত চাকমাগণের দৈহিক প্রকৃতিতে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অথচ তাদের ভাষায়ও সংস্কৃতিতে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির লক্ষণ দেখে, উপরন্তু তাদের জাতি পরিচয় জ্ঞাপক "চাকমা" নামের সংগে 'সাক' নামের সাদৃশ্য দেখে আরাকানবাসীগণের মনে তাদেরকে বিলুপ্ত ব্রহ্মদেশীয় সাক জাতির বংশধর বলে ধারার জন্ম দেয়-এই অনুমানই সহজ এবং স্বাভাবিক।

ফেইরী বিভিন্ন ব্রহ্ম আরাকান কাহিনী বা Chronicle এ ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে বর্ণিত এই প্রাচীন সাক জাতিকে উচ্চ ব্রহ্মের ইরাবতী তীর থেকে আগত বলে তার অনুমান ব্যক্ত করেছেন। (Phayre: History of Burma P. 42-43) ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইতিবৃত্তকার G. E. Harvey ও সাকগণকে ইরাবতী তীরবর্তী প্রাচীন তগৌ থেকে আগত কাদু গোত্রের লোক হিসাবে মনে করেন। বর্তমানের চাক জাতি নানা কিছুর বিচারে উচ্চ ব্রহ্মের কাদু জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে অনুমিত হয়। সে কারণে চাকদের পক্ষেই সাক পরিচয় দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং যদিও ইয়াংজ কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে তবুও সে কাহিনী তাদেরই দাবী করা সাজে। নীচে এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য দেওয়া গেল।

ভাষাতত্ত্ববিদ G. A. Grierson চাক জাতির ভাষা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের ভাষাকে ব্রহ্মদেশের কাদু ভাষা গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন। "Kadu is spoken in the neighbouring Burma districts

of Myitkina, Katha, and upper Chindwin and Gnan is merely a variant of kadu and its speakers as well as those of kadu call themselves 'A-Sak' This leads us on to Sak or thet, Spoken for away in the Akyab district which is allied to kadu. Mr. Taylor tells us that, according to burmese in early days the saks inhabited the upper part of Irrawady valley. Some of those are supposed to have travelled from their original settlement in north-Burma in a South-westernly direction into Arakan. (Gierson: Linguistic Survey of India, Vol-1, Part-1, P.77) এ প্রসংগে গ্রীয়ারসন Kadu এবং Gnan ছাড়া মনিপুরের Andro ভাষার কথাও উল্লেখ করেন। যে ভাষা চাকদের একই ভাষাগোত্রের অন্তর্ভূক্ত। গ্রীয়ারসন অনুমান করেন যে চাকরা উত্তর ব্রহ্ম থেকে সরে আসার সময় তাদের Andro গোত্রের একটি দল মণিপুরে থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরাও নিজেদের 'আচাক' নামে পরিচয় দেয় এবং তারা 'আন্দো' এবং 'ঙারেক' নামে দু'টি গোত্রে বিভক্ত (মেং মং চাকঃ চাক উপজাতি পরিচিতি, গিরিনির্ঝর ১ম সংখ্যা, ১৯৮২ পৃঃ ১৬–২২)। স্থান এবং কালগত দূরত্বের কারণে ধ্বনিতে পরিবর্তন সাধিত হলেও চাকরা যে ব্রহ্ম বাসী Gnan ও মনিপুরের Andro সহ একই ভাষা পরিবারভুক্ত উচ্চ ব্রহ্মের কাদুদেরই বংশধর উপরোক্ত বিবরণ সে ধারণার দৃঢ় সমর্থন দেয়। এ প্রসংগে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত সাক রাজ Kadon সম্পর্কে Harvey-র মন্তব্য ও স্মতর্ব্য। একই প্রবন্ধের নীচের মন্তব্যটিও প্রণিধান যোগ্য–"In Pagan times the that were in the plains from some way south of Pagan North wards to where their kadu kinsmen spread from Tagaung westward to the Mu head water and even beyond the Uyu river. The that Kadu were probably among the earliest burmese to enter Arakan, and entry

reflected in the Yazawin story of kanrajagyis flight from Tagaung to kyaukpandaung plateu."(Harvey: Bayinnaung's Living descendants, Journal of the Burma research Society, 44 (1)) -উপরে Harvey তাঁর স্পষ্ঠ অভিমত ব্যক্ত করেন যে সাক বা চাকরা উচ্চ ব্রহ্মের ইরাবতী তীরবর্তী প্রাচীন নগরী তগৌ থেকে আগত Thet Kadu দের Kinsman। তবে চাকরা আদৌ ব্রহ্ম আরাকান কাহিনীর অতীতের শাক্যজাতির বংশের কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে। সেই সংগে কিন্তু এই কথা ও মনে রাখা দরকার যে ব্রহ্ম-আরাকানী পুরা কাহিনীতে শাক্য জাতি অতি অতিদুরে, অতীতের বুদ্ধে, এমনকি বুদ্ধের জন্মের পূর্বেকার কাহিনী।

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করার বিষয় হার্ভে তাঁর একই প্রবন্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতির গোড়াতে নীচের একটি পংক্তি জুড়ে দেন-"Some Chakmas still call them-selves chak (Thet). অধিকতর আশ্চার্যের ব্যাপার, তাঁর নিজস্ব ভ্রান্ত ধারণার বোঝা তিনি চাকমাদের উপরই চাপিয়ে দিয়েছেন। চাকমাদের কেউ কেউ নিজেদের চাক পরিচয় দেয় এই অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথাটি তিনি কোথায় কার কাছে শুনেছেন জানিনা। জাতি পরিচয় নির্ণয়ে অন্যদের ভ্রম থাকতে পারে কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই ভ্রম অকল্পনীয়। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্ম আরাকানীবাসীদের মুখে উভয় জাতির জন্য ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ Sak বা সাঃ শুনেই তিনি নিজেই অনুরূপ ধারণা গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য লেখকেরা যে প্রায়শঃই চাক ও চাকমা জাতির পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ হয়ে তাদের গোটা ইতিহাসকে গুলিয়ে ফেলেছেন ফলে পরবর্তীদেরকেও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছেন এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ লোকদের দোষ দেয়া যায়না তাদের পক্ষে ভুল করার সম্ভাবনা প্রচুর, কারণ আরাকানবাসীরা পূর্ব থেকেই চাকদের ন্যায় কোন একসময় চাকমাদেরও সাক পরিচয় দিয়ে এই ভুলের সূত্রপাত করে রেখেছিল। কিন্তু হার্ভে, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন পন্ডিতদের পক্ষে এ ভুল মারাত্মক। কারণ সাধারণের পক্ষে পন্ডিতগণের অনুসরণ করাই বিধেয়। অতএব তাঁরা যদি ভুল করেন অন্যদের পক্ষে সে ভুল নির্ণয় করা বা সেগুলিকে সংশোধন করা কঠিন কর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

B. H. Hadgson ১৮৫৩ সালে একটি প্রবন্ধে SAK শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা দেন। সেই তালিকায় প্রদত্ত শব্দগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে

সেগুলির একটিও চাকমা শব্দ নয়। সব গুলিই চাক শব্দ। (B. H. Hadgson: On the Indo chinese boarders and their Connection with the Himalayan and Tibetan, Journal of the Asiatic Society, Vol XXII (1), 1853)

উল্লেখ্য একই প্রবন্ধে দৈন্‌নাক ভাষা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে। "................Of here, the language of the tribe Called Daing-nak appears to be a rudi carrupt dialect of Bengali" যাই হোক এই ভ্রান্ত বিশ্বাস কেবল হার্ভে বা Grieoson এ নয় পরবর্তীকালে Loeffler, Lucien Bernot প্রমুখ অনেক পন্ডিত ব্যক্তিও এই মিথ্যা ধারণাকে অনুসরণ করে সমগ্র ইতিহাসের জট পাকিয়ে ফেলেন। এক ভ্রান্তি অপর ভ্রান্তির জন্ম দেয় একের বিশ্বাস অন্যকেও প্রভাবিত করে। তথ্যগুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করার কষ্ট স্বীকার না করে অনেকেই তার পূর্ববর্তী জনের মতামতকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন। ফলে চাকমা জাতির পরিচয় ও ইতিহাস নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে যে জট পাকিয়ে উঠেছে ভ্রান্ত হলেও একজন পন্ডিতের মতামতকে খন্ডন করে তার যথার্থ স্বরূপটি উন্মোচন করা রীতিমত একটি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জাতীয় ভুলের আর একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া গেল।

Grierson নিজে দৈন্‌নাক ভাষাকে এক জায়গায় Corrupted Bengali স্বীকার করেও কেবল পরম্পরালব্ধ এই ভ্রান্ত ধারণার বশে পরীক্ষা ছাড়াই অপরের কাছ থেকে শুনে সেই ভাষাকে অন্য এক জায়গায় Sak (Lui) group এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং জাতিগতভাবেও তাদের Kadu-Sak বলে ফেলেছেন। "Finally Daignet is the Language much corrupted by the Indo-Aryan Bengali of the descendents of Sak prisoners of war from the valley of the lower chindwin, who were captured by king Mingi of Arakan at the close of the therteenth century and made to settle in Akyab district. (Grierson; Linguistic Survey of India, Vol-1, Part-1,

Page-78) স্পষ্টই তিনিও ইতিপূর্বে বর্ণিত ইয়াংজ কাহিনীকে একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে ধরে নিয়েই উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তাঁর সূত্র কী ছিল জানা যায় না। সতীশ ঘোষের চাকমা জাতি এবং ভুবনমোহন রায়ের চাকমা রাজবংশের ইতিহাস পুস্তক দু'টি তার এ তথ্যের ভিত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয় এবং ভুবনমোহন রায়ের পুস্তিকাটি প্রথমে ইংরেজী সংস্করণেই ছাপা হয়। Grierson এর Linguistic Survey গ্রন্থটি সে সময়ের প্রায় বছর দশেক পরেই রচিত এবং প্রকাশিত হয়। আবার একটি গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় Grierson লিখেছেন 'Another Mongred Lang age is Daingnet. Some people claim it to be Bengali, but the latest Cataloguers put it down as corrupt form of chin and as such it is recorded in there pages. উদ্ধৃতিতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি স্বয়ং দৈন্নাক ভাষা পরীক্ষা করেননি অন্যের কথার উপর আস্থা স্থাপন করেই তিনি তার মতামত দিয়েছেন। এই Latest Cataloguers-রা কারা, দৈন্নাক ভাষাকে কত গভীর ভাবে তাঁরা পরীক্ষা করেছেন, বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান কত গভীর সে বিষয়ে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। ইতিপূর্বে পাদটীকায় দৈন্নাকদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১৮৪১ সালে Sir Arthur Phayre আরাকানে প্রচলিত ভাষা সমূহের তুলনামূলক আলোচনার জন্য একত্রে বিভিন্ন ভাষার একটি শব্দ তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকায় দৈন্নাক ভাষাকে যুক্ত করা হয়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেই শব্দ তালিকা যুক্ত হয়েছে *। পাঠকগণ শব্দ তালিকা পাঠ করে সেই ভাষা Corrupt form of chin হতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অবশ্য তালিকায় শব্দ সংখ্যা মাত্র ৩৮টি। এই ৩৮টি শব্দের মধ্যে একটি মাত্র আরাকানীমূল শব্দ ব্যতীত বাকী যাবতীয় শব্দই দৈন্নাক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত চাকমা বাংলা শব্দ। দীর্ঘদিন আরাকান বাস করার ফলে স্বভাবতই যে কিছু আরাকানী মূল শব্দ ভাষায় অনুপ্রবিষ্ঠ হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে

---

* পাণ্ডুলিপিতে শব্দ তালিকাটি পাওয়া যায় নাই। তাই An account of Arakan Journal of the Asiatic Socitey of Bengal, 1841, Vol. No. 117 দ্রষ্টব্য

না । কিন্তু এ কারণেই সে ভাষাকে Sak (Lui), chin বা Arakanes হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না । ভাষার ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যার হার বিবেচনা করে তাকে Corrupted by Bengali না বলে বরং Bengli Corrupted by Arakanese or chin বলাই সমীচীন । পন্ডিত ব্যক্তিও যে মাঝে মাঝে বড় রকম ভুল করেন তার আরও একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এটি । মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম । কিন্তু তাদের ভুলের বোঝা টানতে হয় অপরকে । চাকমাদের উপর লিখিত Lewin, Huchinson প্রভৃতি ইংরেজ শাসকেরা প্রাথমিক যুগের ইংরেজ লেখকগণের পুস্তকগুলিতে সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে । অতঃপর সতীশ চন্দ্র ঘোষ ব্রহ্ম–আরাকান ইতিহাসের খিচুঁড়ি পাকানো একটি অভিনব চাকমা ইতিহাস খাড়া করেন ।

সংগে সংগে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণও এক বাক্যে এই 'থিয়োরী' সমর্থন করে সতীশ ঘোষ এবং তাঁর বইটিকে চাকমা ইতিহাসের অথরিটি হিসাবে দাঁড় করান । পরে পরে আরও অন্যান্যেরা এই থিয়োরীকে জোরদার করার জন্য কোমর কষে মাঠে নেমে পড়েন । সতীষ ঘোষের চাকমা জাতি গ্রন্থটি এ যাবৎকাল পর্যন্ত চাকমা জাতির ইতিহাস ও অন্যান্য পরিচয় সম্পর্কে একমাত্র অবলম্বন । সুতরাং অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে পরবর্তী ইয়োরোপীয় পন্ডিতগণও সেই সূত্রটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রইলেন বা ধরে থাকতে বাধ্য হলেন । এভাবেই ক্রমে ক্রমে স্বজাতীয় বিজাতীয় পন্ডিত অপন্ডিত নির্বিশেষে সকলের মনে চাকমাগণ যে অতীতের ব্রহ্মদেশীয় সাক জাতির বংশধর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে এবং তাদের ইতিহাসকে অযথা ব্রহ্ম–আরাকান ইতিহাসের সংগে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা হয় যে বর্তমানে সেই জট খোলা কঠিন ব্যাপার ।

মইচাগিরি পতনের পরবর্তী কাহিনী

পুনরায় পূর্ব পরিত্যক্ত কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে মইচাগিরি পতনের পরবর্তী কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে । 'চাকমা জাতি'তে লিখিত তৎপরবর্তী বিবরণ নিম্নরূপঃ– "কিয়ৎকাল পরে আরাকানের প্রধানমন্ত্রী পাংগাওগ্যা রাজাকে জানাইলেন যে উচ্চ ব্রহ্মের চাকমা রাজ মংছুই বৌদ্ধ ধর্মের আচার নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না,------এই সংবাদে বিচিলিত হইয়া মঘরাজ মংজাম্রু হইতেও চাকমারাজকে তাড়াইলেন । তিনি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া প্রজাবর্গসহ আরাকানের অন্তর্গত কলোদাই নদীকূলে চাক্যেই ধাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন । কিন্তু এখানেও তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই ।

কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মংছুইয়ের পুত্র মারেক্যজের সহিত আরাকানাধিপতির পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মারেক্যজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তিনি প্রজাবৃন্দ সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন (৭৮০ মঘাব্দ, ১৪১৮–১৯খৃঃ)। বাংলার নবাব তাঁহাদিগকে বারখানি গ্রামে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তথায় বহুদিন ধরিয়া তাহারা হীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর সেখানেও তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়"। দেঙ্গ্যাওয়াদির বিবরণে এই সময়ের অর্থাৎ ১৪১৮ সালের আরাকান রাজ্যের নাম নেই। স্বর্গীয় বিরাজ মোহন দেওয়ান মরহুম মাহ্বুব আলমের "চট্টগ্রামের ইতিহাসের" সূত্রে উল্লেখ করেন যে সম্ভবতঃ রাজা কমরুইয়ের আমলে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু আরাকান ইতিহাসে দেখা যায়, এ সময় আরাকান সিংহাসনে প্রকৃত পক্ষে কোন রাজাই ছিলেন না। এ সময়ে আরাকান ইতিহাস Phayre এভাবে বর্ণনা করেছেন-"The Arrakanese annals at this time narrate how the country was for many years in great confusion and that usurpers, one after another, become the ruleos, At length, the native king Meng Saamwun was driven from his kingdom (1406 A.D) by an army sent by Pyinsing Mengswa, called also Meng Khamaung, King of Burma, Which took possession of the capital then Laungkyet. Meng Soamwun fled to Bengal.........the dethroned king was for twenty four years residing in Bengal. অবশেষে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতানের সহায়তায় Meng Soamwun রাজ্য ফিরে পান। রাজ্য ফিরে পেয়ে তিনি Laungkyet থেকে তাঁর রাজধানী Mrauk-U বা ম্রোহং-এ স্থানান্তরিত করেন। ১৪০৬ থেকে ১৪৩০ সাল অবধি রাজ্যচ্যুত থাকায় মধ্যবর্তী সময় ১৪১৮–১৯ সালে দেঙ্গ্যাওয়াদির বিবরণানুযায়ী চাকমা রাজ্যের সংগে আরাকান রাজের সংঘর্ষের প্রশ্ন উঠে। কারণ এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে আরাকানের সিংহাসনে প্রকৃতপক্ষে কোন রাজাই ছিলেন না। আরাকানকে কেন্দ্র করে সে সময় ব্রহ্মরাজ (আভা) Meng Khamaung এর সংগে পেগুর তলইংরাজ Rajadirit এর ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে থাকে। প্রথমে ব্রহ্মরাজের জামাতা

কমরু Anoarahta উপাধি নিয়ে কিছুদিন আরাকান শাসন করে। পরে পেগুরাজ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেন এবং নিজের একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কয়েক বছর বাদে (১৪১০) পুনরায় ব্রহ্মরাজ পেগু প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে নিজের একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। দিন কয়েক পরে পুনরায় পেগুরাজ তাকে তাড়ান। এমনিভাবে হয় আভা নয়ত পেগুর অধীনে আরাকানের শাসন চলতে থাকে। Phayre-র বর্ণনায় পাই-"Kamaru, the son-in-law of Meng Khamaung had been made Governor of Arakan, with the title of Anoarahta. He was at the capital in the northern part of the kingdom. The Talaing army marched there. Kamaru was taken Prisoner, with his wife and children. They were carried to Bassein, Where he was cruely put to death, and his wife was taken into Rajadirit's palace as one of the queens." এই ঘটনা ঘটে ১৪০৭ সালের দিকে। কাজেই ১৪০৭ সালে কমরু নিজেই নিহত হওয়ায় ১৪১৮-১৯ সালে তার পক্ষে চাকমা রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে বাংলায় তাড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। রাজশক্তি হিসাবে এ সময় আরাকানের নিজস্ব কোন সত্ত্বা ছিলনা সুতরাং এ সময় (১৪১৮-১৯ খৃঃ) তথাকথিত চাকমারাজ মংছুইয়ের পুত্র মারেক্যজের সংগে আরাকান রাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার ঘটনা নিছক বানোয়াট। আরাকানের যখন এই দুরবস্থা তখন উচ্চ ব্রহ্মের "মংজাম্রু" নামে তথাকথিত চাকমা রাজধানীর উপর আরাকান রাজের কর্তৃত্ব থাকার সম্ভাবনাও কল্পনা বিলাস মাত্র। উচ্চ ব্রহ্ম থেকে আরাকানের-------- চক্যেইধাও কে জানে 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং' এর গ্রন্থকার আরাকানরাজ 'মংছুমন' এর পলায়নের ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে চাকমা রাজ 'মংছুই' এর পলায়ন অথবা আভারাজ Meng Khaung-এর অপর নাম Mengswa এর পলায়ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিনা ? আভারাজ Meng Khaung বা Mengswa-এর বীর পুত্রের নাম ছিল-Mengrai Kyoaswa" যিনি উচ্চ ব্রহ্মে সান বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। এই Mengrai Kyoaswa, যা বাংলা করলে দাঁড়ায় 'মেংগ্রেক্যস'-তাকেই কাহিনীতে "মারেক্যজ করা হয়েছে কিনা তাও কে বলতে পারে ? কাহিনী

স্রষ্ঠার পক্ষে স্বজাতির অপবাদ ও লজ্জার কাহিনী অপরের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু নয় *।

যাই হোক, যদি তেমন কোন ঘটনা ঘটেও থাকে, সে চাকমা রাজার বেলায় হউক বা চাক রাজার বেলায় হউক, সে ঘটনা হবে অনেক পূর্বে বা অনেক পরে। সেই কালের আরাকান ইতিহাসের সংগে আমরা কোনমতেই দেঙ্গ্যাওয়াদির বিবরণ মেলাতে পারি না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সে সময় কোন 'সাক' বা চাকমা রাজা বাংলায় পালিয়ে আসেন তবে 'বাংলার নবাবের' নিকট থেকে বারখানি গ্রামে বাস করার অনুমতি লাভ করার ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে। কারণ বাংলার নবাব উপাধি প্রচলিত হয় বর্ণিত ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে। ৭৮০ মঘাব্দে (১৪১৮ খৃঃ) এই ঘটনার সময় বাংলার নবাব (?) কে ছিলেন তা দেঙ্গ্যাওয়াদির গ্রন্থকার না বললেও অন্যান্য লেখকগণ বাংলার ইতিহাস ঘেঁটে স্থির করেছেন যে ইনি গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন বা যদু, কারণ বাংলার ইতিহাস পুস্তক সমূহে লেখা আছে ঐ বছরই সুলতান জালালুদ্দিন গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু জালালুদ্দিন ১৪১৮ সালের ঠিক কোন তারিখে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন তা স্পষ্ট করে ঐ সব ইতিহাস পুস্তকে লেখা নেই। ঐ একই সালে (১৪১৮) দনুজমর্দনদেব নামে আর এক রাজা চট্টগ্রামের টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরী করেন বলে জানা যায়। তাকে কেউ কেউ জালালুদ্দিনের পিতা বলে মনে করলেও পন্ডিতেরা সকলেই একমত নন। "........But his personality continues to be problem, for aught we know, Danuj Mardan may have been just one of the north Bengal Koch chief." (Chatherjee, Dr. S.K.: Kirata Jana Krti, reprint cal, 1974, P 116) দেঙ্গ্যাওয়াদিতে উপরোক্ত ঘটনা ৭৮০ মঘীতে সংঘটিত হয় বলে বর্ণিত হয়েছে। মঘী ৭৮০ সালে অধিকাংশ সময়ই ইংরাজী ১৪১৮ সালের মধ্যে পড়ে (মঘী সাল মোটামুটি মার্চ মাসেই আরম্ভ এবং শেষ হয়)। কাজেই ৭৮০ মঘাব্দের যে নির্দ্দিষ্ট তারিখে মারেক্যজ পালিয়ে এসেছিলেন সেই তারিখে গৌড়ের সিংহাসনে দনুজমর্দনদেব ছিলেন না জালালুদ্দিন ছিলেন তা বলা যাচ্ছে না। তাছাড়া মারেক্যজ যদি ঐভাবে

---

* আরাকানী ভাষায় লিখিত বর্মী নামগুলি সতীশ ঘোষও নিশ্চয় ঠিকমত লিখতে পারেননি। অতএব ব্রহ্ম-আরাকানী ইতিহাসে উদ্ধৃত নামগুলির সংগে এই নামগুলি মিলিয়ে ইতিহাসের তুলনামূলক বিচার করাও দুষ্কর।

পালিয়েও আসেন তবে তাঁর পক্ষে অবশ্যই পূর্ব থেকেই এই ব্যাপারে সুলতানের (নবাব নয়) সংগে বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন ছিল। সে অবস্থায় ঐ সুলতান জালালুদ্দিন হতে পারেন না। তা'ছাড়া বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে চট্টগ্রামের একেবারে সীমান্ত অঞ্চলে তৎকালে গৌড়ের কোন সুলতানের আধিপত্য ছিল মনে করাও কষ্টকর। ইতিহাস এ বিষয়ে কোন সঙ্কেত দিতে পারে না। আমরা ইতোপূর্বেই দেঙ্গ্যাওয়াদির তথ্যগুলির প্রামান্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলাম।

দেঙ্গ্যাওয়াদির সূত্রে সতীশ ঘোষের উপরোক্ত বিবরণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফেইরী, হার্ভে প্রমুখ প্রখ্যাত ইতিবৃত্তকারগণের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিবরণগুলির সংগে সেগুলি একেবারেই অসংগতিপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ বিপরীত। সহজবুদ্ধিতে ও বোঝা যায় যে অধিকাংশ বিবরণই অবিশ্বাস্য আজগুবি কাহিনীতে ভরা, তা'ছাড়া কালানুক্রমিক ক্রটিতে পরিপূর্ণ কাহিনীগুলিকে ঐতিহাসিক বলে স্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়। আগেই বলা হয়েছে বইটির কোন কপি এখনও আমরা হাতে পাইনি সেজন্যে অন্যান্য প্রসঙ্গাদিতে কি পরিমাণ গাঁজাখুরি আছে সে কথা এখানে আর বলা যাচ্ছে না। মোট কথা, দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং এর বরাত দিয়ে সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রনীত ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাসে খিঁচুড়ি পাকানো চাক্‌মা জাতির ইতিহাস অংশটি একটি প্রকান্ড মিথ্যা বই আর কিছু নয়।

বাংলার আরাকান সীমান্তে

ইতিবৃত্তকারগণের হাতে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সিরিত্তমার সময় থেকে মারেক্যজ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় হাজার বৎসর কাল যাবত ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে নির্বাসনদন্ড ভোগ করেছিলাম। এবারে তাঁরা আমাদের নিজের দেশের সীমানার অভ্যন্তরে এনে ফেলেছেন, যদিও দন্ডের রেশ এখনো পূরো কাটেনি। উপরোক্ত ঘটনার পরবর্তী প্রায় একশ বছর কালের চাকমা জাতির ইতিহাসের কোন আলোচনা সতীশ ঘোষ রাখেন নি। অতঃপর প্রাসঙ্গিকভাবে ১৫১২–১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ ধনমানিক্যের সেনাপতি চয়চাগের চট্টগ্রাম বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি ১৫১৬–১৭ খৃষ্টাব্দে 'মঘ রাজার সেনাপতি ছেন্দুইজা' কর্তৃক চাকমা রাজ চনুই এর বশ্যতা স্বীকার, কোংলা প্রু খেতাব প্রাপ্তি, মঘরাজার নিকট 'ছাজাং–ইয়ু–নাম্নী তদীয় দুহিতাকে অর্পন (১৫২০খৃঃ) প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ দেন। সে সময় আরাকান সিংহাসনে ছিলেন Men-Ra-dya। পুনরায় প্রায় আশি বছর বাদ দিয়ে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ Men-Radzagyi-র (চাকমা জাতির

মন্দ্রজগিরি) শাসনামলে তৌঙ্গু রাজের সাহাযার্থে আরাকান রাজের পেগু অভিযান এবং চাকমা রাজার শ্যাম রাজধানী ব্যাংকক জয়ের বিবরণ দেখতে পাই। মাঝখানের প্রায় আশি বছরের কোন বিবরণ সতীশ ঘোষ দিতে পারেননি। তবে মন্তব্য করেছেন "এই সময়ে চাকমা রাজের ভাগ্যলক্ষী কাহার অঙ্কশায়িনী ছিলেন ইতিহাস লেখকগণ তাহা স্পষ্ঠ রূপে লিখিয়া না গেলেও ইহা বোধহয় অভ্রান্ত যে, চট্টগ্রামের সৌভাগ্য নেমি পরিবর্তনের সংগে সংগে চাকমা রাজের অদৃষ্টও পরিবর্তিত হইতেছিল।"

পেগু অভিযানের বিবরণ নিম্নরূপ –"..............চাকমা রাজার অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য ও মঘরাজার এক মন্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ৯৬০ মঘীতে (খৃষ্টীয় ১৫৯৮–৯৯ অব্দে) যুদ্ধযাত্রা করিয়া মুঙ্ধামা নগরের ঈশান কোণে ছারোয়া ম্রাঙা খালের পথে কামল পাহাড়ের উপর চাকমা রাজ কোংলা প্রুকে পূর্বোক্ত ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ রাখিলেন। অতঃপর চাকমা রাজার খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি নিকটবর্তী (শ্যামের রাজধানী) ব্যাংকক রাজ্যের উপর আপতিত হয়েন এবং রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাচাময়কে ধৃত করিয়া আরাকানাধীশ্বরের সম্মুখে আনিয়া দেন।"

ব্রহ্ম ইতিহাসেও উপরোক্ত অভিযানে সে সময় একজন সাকরাজার অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে। সে সময় পেগু সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত Bureng Naung এর পুত্র Nanda-Bureng বা নন্দ রিয়াং। তঙ্গু রাজের সাহায্যার্থে আরাকান রাজ Meng-Ra-dza-gyi–র পুত্র Meng Khamung পেগু আক্রমণ করেন এবং Syrian (রেঙ্গুনের নিকট Thanlyen) দখল করেন। হার্ভের বিবরণেও পাই -"A Thetmen was among the Arakanese Commander attacking Nanda Baying in 1599, he drove off the Siamese who tried to join in looting pegu." ইতিহাসাশ্রয়ী আরাকানী লোককাহিনী বা Chronicle এ উল্লেখিত সাক বা Thet শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয়ে অসুবিধা হেতু এই Thetmin বা সাকরাজ কে ছিলেন তা বলা যায় না। তিনি একজন চাকমা রাজা হলেও হতে পারেন। কারণ প্রায় আধুনিককালের গোড়ায় এসে মোটামুটি এ সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই আরাকানবাসীগণ কর্তৃক সাক বা Thet নামে প্রকৃত চাকমাগণকে চিহ্নিত করা শুরু হয় বলে ধারণা করা যায়। ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসেও এ সময়ের কিছু পূর্ব থেকে SAK বা THEK জাতির তৎপরতার প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই। হার্ভে এই Thetmin এর পরিচয়

দেননি। সতীশ ঘোষের পরবর্তী চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণ সেই ঘটনা চনুই বা তাদের সংস্কারকৃত নাম জনু'র আমলের বলেই বর্ণনা করেন এবং সাথে সাথে এও উল্লেখ করেন যে জনু'র রাজত্বকাল ছিল অবিশ্বাস্যরকমভাবে দীর্ঘ ১২২ বছর। দেঙ্গ্যাওয়াদিতে এই রাজার নাম আছে 'কোংলা প্রু' যা আসলে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের দিকে রাজা 'চতুই'কে প্রদত্ত একটি খেতাব। সে কারণেই সম্ভবতঃ ইতিবৃত্তকারগণ জনুর রাজত্বকাল অস্বাভাবিক দীর্ঘ কল্পনা করতে বাধ্য হন। কিন্তু মনে রাখা দোষ কার যে 'কোংলা প্রু' একটি খেতাবমাত্র যা পরবর্তী রাজাকেও দেওয়া যায়। যাই হোক, জনু যদি ১২২ বৎসর রাজত্ব করে থাকেন তবু এত বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে আরাকান রাজের একজন সামন্ত নৃপতি হিসাবে চাকমা রাজের প্রতিনিধি স্বরূপ যুবরাজ বা অন্য এক রাজপুত্রের পক্ষে উক্ত পেগু অভিযানে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাংকক জয়ের ঘটনা স্পষ্টতঃ অতিরঞ্জন। ব্রহ্ম দেশের ইতিহাস সে অভিযানকালে ব্যাংকক জয়ের ঘটনার সমর্থন মিলে না। সে সময় শ্যাম রাজ Bynaret যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিলেন। পেগুরাজ Bureng Naung বার বার শ্যাম আক্রমণ করেও শ্যামরাজ Bynaret কে কাবু করতে পারেন নি। প্রতিবারেই তিনি পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত পেগুর যুবরাজ যুদ্ধে নিহত হন।

পেগু অভিযানের বিবরণ শেষে দীর্ঘ এক শতাব্দীরও অধিককাল সময়ের কোন আলোচনা না রেখে সতীশ চন্দ্র ঘোষ একেবারেই ইংরেজ আমলের কাগজপত্রের সূত্রে প্রাপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর চাকমারাজ জালাল খাঁ মতান্তরে ফতে খাঁর প্রসঙ্গ শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তীকালের ইতিহাস আধুনিক যুগের প্রামান্য তথ্যাবলীতে পূর্ণ স্বীকৃত ইতিহাস। এ সময়ের ইতিহাসে কিছু কিছু অসংগতি সত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্যাদির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ নেই। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী শতাধিক কালের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ একমাত্র "পাগালা রাজার" হত্যা ও ধাবানার রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী ছাড়া সতীশ চন্দ্র ঘোষ দিতে পারেন নি। চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতিতে মোটামুটি এই কাল থেকেই আমরা প্রকৃত ইতিহাসের গল্প পেতে শুরু করি। কদম থংজা, তৈন সুরেশ্বরী, ভেরেনী রন পাগালা, বুড়া বড়ুয়া, পাগালা রাজা, অমঙ্গলী, ধাবানা, ধূর্য্যা, কুয্যা প্রভৃতি নামে এবং তৈনছড়ি নদীর যুদ্ধ, আলীকদমে রাজ্য পাট, পাগালা রাজার হত্যা প্রভৃতি বিবরণে বাস্তবতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু জনশ্রুতিতে বর্ণিত ঐ সমস্ত নাম এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ থেকে একটি সুষ্ঠ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা কষ্ঠকর। চাকমা জাতির

ইতিবৃত্তকারগণের বিবরণে দেখতে পাই যে আরাকান রাজ Meng Soamwun এর (কোন কোন ইতিবৃত্তে তাকে নর মিখলা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে) পরবর্তী রাজ Meng Kari (১৪৩৪-৩৯) সময়ে রাজা তৈন সুরেশ্বরীর (তৈন ছাড়ীশ্বর ?) সেনাপতি রণ পাগালার সংগে তৈনছড়ি নদীকূলে আরাকান রাজের এক সংঘর্ষ হয় এবং আরাকান রাজ যুদ্ধে সন্ধি করতে বাধ্য হন। জনশ্রুতিলব্ধ এই ঘটনার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা ছাড়া ঘটনার কাল এবং এর সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যে ১৪১৮ সালে আরাকান থেকে চরম বিপর্যস্থ অবস্থায় প্রত্যাগমনের পর মাত্র ষোল আঠার বছরের ব্যবধানে আরাকান রাজ Meng Khari-র সময়ে চাকমাদের পক্ষে এই সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে। তা'ছাড়া এতদিন ব্যাপী প্রচলিত ইয়াংজ, চজুং, মারেক্যজ প্রভৃতি বর্মী নামের স্থলে রাতারাতি কিভাবে রাজা বা রাজপুরুষগণের নাম একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায় 'রন পাগালা' ইত্যাদিতে পরিণত হতে পারে ? একটি জাতির ভাষা এবং সংস্কৃতি কি এমনি জিনিষ যা ছেঁড়া পোষাকের ন্যায় এক নিমিষেই ঝেড়ে ফেলা যায় ? কাহিনীর এই বিরাট অসংগতির দিকটি লক্ষ্য করলে আমাদেরকে হয় প্রথমটি নয়ত দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মারেক্যজের স্বদেশ প্রত্যাগমন অথবা আরাকানের সংগে এ সময়ের সংঘর্ষ এ দু'টির একটিকে সম্ভাব্যতা বাতিল করতে হয়। সতীশ চন্দ্র ঘোষ এ ঘটনা ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের দিকে ঘটে বলে অনুমান করেন।

ইতিহাস সমীক্ষার ফলাফল

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সতীশ ঘোষের নির্দেশিত পথের সংকেত ধরে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসের কাল পরিক্রমা সমাপ্ত করেছি। দেঙ্গ্যাওয়াদির অভিজ্ঞাপত্র হাতে নিয়ে এই দীর্ঘ পথের নানা ঠিকানায় পরমাত্মীয় জ্ঞানে অনেক আলকোজ্জল রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বার পেরিয়ে রাজন্যবৃন্দের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও তাঁদের মুখের চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিচয়ের আভাস ফুটে উঠেনি। দূর থেকে রাজা বিজয়গিরির সাত চমূ বিজয়ী কাহিনীর কোলাহল শুনেছি কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পাইনি। নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে কীর্তিমান রাজা সিরিত্তমার সাক্ষাৎ মেলেনি। পথের শেষ প্রান্তে এসে যখন তাঁর সাক্ষাৎ পাই তাঁর অজানা মুখের চেহারা দেখে আহত অভিমানে নিজেদের দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। মইচা গিরির রাজা অরুণ যুগ ভেবে কাছে গেলে মৈনসাং এর সান রাজ ভ্রূকুটি ভরে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই ভাবে পরমাত্মীয় ভেবে রাজপুত্র চজুং,

চৌত্মু, মৈসাং মারেক্যজ প্রভৃতি কতজনের মুখ চেনার চেষ্টা করেছি কিন্তু বিজাতীয় চেহারা দেখে বার বার আহত অভিমানে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। কোথাও আমাদের প্রত্যাশা সফল হয়নি। সতীশ ঘোষ, তথা দেঙ্গ্যাওয়াদির প্রদর্শিত ইতিহাসের মুকুরে কোথাও নিজের জাতির চেহারা প্রতিফলিত হয়নি।

বিজয়গিরির লোককাহিনীর আমলকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া অবধি দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের এই কল্পিত ইতিহাসের পথকেও আমরা কয়েকটি লম্বা লম্বা পা ফেলেই পার হয়ে এসেছি। বিজয়গিরি ও সিরিত্তমা প্রসংগের প্রায় ৮০০ বছর পরে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের মইচাগিরির নগরীর পতন বৃত্তান্ত, এরপর ৭৫ বৎসর পরে ১৪১৮ সালে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ ও বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ, এরপর ১০০ বছরের ব্যবধান শেষে ১৫২০ সালে রাজা জনুর বশ্যতা স্বীকার কাহিনী, পুনরায় ৮০ বছর পরে পেগু অভিযানের বিবরণ, এরপর প্রায় ১২০ বছর পরে একেবারেই আধুনিক কালের জালাল খাঁর কাহিনীর শুরু। দেখা যায় যে, এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাস অধিকাংশই ফাঁকা। যদি বিজয়গিরির কাহিনীকে নিছক কাব্য কাহিনী হিসাবে ধরি এবং চাকমা ইতিহাসের ব্রহ্মদেশীয় অংশের অপরাপর কাহিনীগুলি ব্রহ্মদেশীয় সান বা সানদেশীয় অপর গোত্রের কাহিনী বলে স্বীকার করি তবে দেখি প্রায় সবটাই ফাঁকা শতকরা প্রায় একশ' ভাগই ফাঁকা। গভীর হতাশায় মুহ্যমান হলেও এটিই নির্মম সত্য। এই কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আমাদের কোন উপায় নেই। দিগভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দীর্ঘ ক্লান্তিকর পরিব্রাজন শেষে এতদিনের পরিক্রান্ত পথটিকে যদি নিতান্ত ভূল বলে প্রতীয়মান হয় তবে বিষাদ ক্লিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য রূঢ় এবং অপ্রিয় হলেও কখনও অসুন্দর নয়, অশুভ নয়। এতদিনের বালুকায় গড়া সৌধমালা যদি এক নিমিষে ধূলিসাৎ হয় তথাপি তাতে আক্ষেপ করার কিছু নেই। বরং এই ভেবে আনন্দ করা উচিৎ যে, এতদিনের প্রকান্ড মিথ্যা, এতবড় প্রবঞ্চনা, এতদিনের বিভ্রম আজ ধরা পড়েছে।

আশা করি, ধূলি লুণ্ঠিত ইতিহাসের জঞ্জাল স্তুপ, পরিষ্কার করে আগামী দিনের নবীন স্থপতিরা নূতন করে ইতিহাসের ধবল প্রাসাদের ভিত্তি রচনায় ব্রতী হবেন। দিগভ্রষ্ঠ পূর্বসূরীগণ যে পথ দিয়ে এগিয়েছেন সে পথ পরিত্যাগ করে নূতন ভাবে আবার ইতিহাসের পথের রেখা খুঁজে নিতে হবে। সে পথের রেখা যতই ক্ষীণ হউক, যতই অস্পষ্ঠ হউক, যতই দুর্লক্ষ্য হউক আশাকরি প্রয়োজনীয় শ্রম এবং যর্থার্থ নিষ্ঠা সহকারে অনুসন্ধান চালানো হলে সঠিক পথের রেখা একদিন খুঁজে পাওয়া যাবেই। অলীক স্বপ্ন দিয়ে গড়া মায়ার ভূবনে কৃত্রিম স্ফটিকে নির্মিত

মনোহর ভবনে বাস করার চাইতে বাস্তব পৃথিবীর কঠিন মাটিতে পত্র পল্লবে ছাওয়া পূর্ণকুটিরে বাস করা অনেক শ্রেয়।

পরিশিষ্ট—১

Cpt. T H. lewin লিখিত The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein পুস্তক থেকে। Chief of Chittagong এর নিকট লেখা বর্মী সম্রাট Tur boomah-র পত্রের অংশ বিশেষ।

"I am lord of a whole people and of one hundred and one countires and my titles are Rajah Chatterdary (sitting under a canopy) and Rajah Suruj Bunshee (descendant of the sun, and sitting under a splendid canopy of gold). I hold in subjection to my authority many Rajahs. Gold, Silver and Jewels are the produce of my country; and in my hand is the instrument of war, that, as the lightning of heaven humbles and subdues my adversaries. My troops require neither injunctions nor commands, and my elephants and horses are without number. In my service are ten Pundits, learned in the shaster, and one hundred and four priests, whose wisdom is not to be equalled, agreably to whose learning and intelligence I excute and distribute justice among my people, so that my mandates, like the lightning, sufer no resistance or control. My subjects are endowed with virtue and the principles of justice and refrain from all immoral practices; and I am as the sun, blessed with the light of wisdom to discover the secret

designs of men.

"Whoever is wortly of being called a Rajah is merciful and just towards his people. Theives, robbers and disturbers of the peace, have at length received the punishment due to their crimes and now the word of my mouth is dreaded as the lightning from heaven.

"I am as a great sea among two thousand rivers and many nullahs; and I am as the Mountain Shuncroo, surrounded by forty thousand hills, and like unto these, is my authority extending itself over one hundred and one Rajahs. Further, ten thousand Rajahs pay daily attendence at my durbar, and my country excels every country in the world. My palace, as the heavens, studded with gold and precious stones, is revered more then any other palace in the universe. My occupations resemble the business of the chief angels, and I have written unto all the provinces of Arracan with orders to forward this letter in safety to Chittagong, formerly subject to the Mogul Rajah, by whom the country was cultivated and populated and who erected twenty-four hundred palaces of public worship, and made four and twenty tanks (here follows a long list of the names of palaces and forts said to have been erected by the above Rajah) and by Umbung Dumah,*

Rajah of Omerpoor. Provinces to his accession to the Rajagyee, the country was subject to other Rajahs, whose title was Chatterdary (sitting under a canopy), who erecfted places of worship and appointed priests to administer the rites of religion to people of every denomination (observe the tolerance of the Buddhist): but at that period the country was ill governed, previous to the accession of Rajah Serytumah Chuckah to the government of the countries of Ruttenpoor, Doogwady, Arracan, Doorgapuutty, Ramputty, Chaydoge, Mahodyne, Manang, in whose time the country was governed with justice and ability, and his wisdom was a shining light, and the people were happy under his administration. He was also favoured with the friendship of the religious men of the age, one of whom, by name Buddha, resorted to his place of residence, and was solicited by the Rajah to appoint some one for the purpose of instructing him in religious rites; and Thaw-timarey was accordingly appionted agreeably to the Rajah's requistion.

"At this time it rained from heaven, gold, and silver and precious stones, which were buried under ground in charge of the above priest, whose house also was of gold and silver workmamship, to which the people resort and worship the deities; and the Rajah kept a

large establishment of servants and of slaves at the temple for the service of travellers and passangers, and his time was engaged in the studying of the five books. He always refrained from immoral practices and deds interdicted by his religion, and his priests abstaind from the flesh of geese, pigeons, goats, hoags and of fowls; and wickedness and theft, adultery, falsehood, and drinking, were unknown in that age.

"I like wise presserve a line of conduct and religion similar to the above, but previous to my conquest of Arracan, the people were as snakes wounding men a prey to enmity and disorder; and in Magadha, Mayenwong, Darawody, Chagadag Rahmawady, there were eaters of the flesh of man, and wickedness prevailed aimongst them, so that no man relied upon his neighbours. At this time, one Buddha Dutta, otherwise, Seeryboat Thakoor, came down in the country of Arracan, and instructed the people and the beasts of the field in the principles of religion and rectitude, and, agreeably to his word, the country was governed for a period of five thousand years, so that peace and good-will subsisted among them.

"Agreeably here to is the tenor of my conduct and goverment of my people. And as there is

an oil, the produce of a certain spot of the earth, of exquisite flavour, so is my dignity and power above that of all other Rajahs; and Jatboo, the high priest, having consulted with others of that class, represented to me, on the 15th of the month. Praso 1148, saying do you enforce the laws and customs of Serry boat Thakoor, which I accordingly did, and more over, erected places of divine worship. and have conformed myself strictly to the laws and customs of Serry-Tumah Cuckah, governing my people with lenity and justice.

"As the country of Arracan lies configuous to Chittagong, if a treaty of commerce were established between me and the English, perfect unity and alliance would ensue from such engagements. I therefore have submitted it to you that the merchants of your country should resort hiter for the purpose of purchasing pearls, ivory, wax, and that in return my people should be permitted to ressort to chittagong for the purpose of traffieing in such commodities as the country may afford, but as the Mughs residing at chittagong have deviated from the principles of religion and morality, they ought to be corrected for their errors and irregularities according to the written laws, in so much as those invested with power will suffer eternal punishment in case of any deviation from

their religion and laws, but whoever conforms his conduct to the strict rules of piety and religion will here after be translated to heaven. I have accordingly sent four elephants teeth under the charge of 30 persons, who will return with your answer to the above proposals and offers of alliance."

পরিশিষ্ট—২

অশোক কুমার দেওয়ান
(১৯২৬–১৯৯১)

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবীণ শিক্ষাবিদ, খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক এবং রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনৃষ্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অশোক কুমার দেওয়ান রাঙ্গামাটির মগবান গ্রামে ১৯২৬ সনে এক সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম মদন মোহন দেওয়ান । খুব অল্প বয়সে গৃহ শিক্ষকের অধীনে প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৩৬ সনে রাঙ্গামাটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ৩য় শ্রেনীতে ভর্তির মাধ্যমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু । মাত্র ১৬ বছর বয়সে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ করেন । এরপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা গমণ করেন । ১৯৪৩ সনে জুলাই মাসে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেনীতে ভর্তি হয়ে তিনি ১৯৪৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । অতঃপর কলিকাতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথারীতি ভর্তি হন । কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি উক্ত কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি । পরবর্তীতে তিনি আবার কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে স্নাতক ডিগ্রীতে ভর্তি হন । ঐ সময়ে তিনি বৃটিশ ভারতের বুদ্ধ গয়ায় অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে (বাবু বিনয় কুমার দেওয়ান প্রাক্তন জাতীয় সংসদ সদস্য সহ) যোগদানকরেছিলেন।

তখন থেকেই তিনি বুড্ডিষ্ট হোষ্টেলে থাকাকালীন সময় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা স্নেহ কুমার চাকমা প্রমুখদের সংস্পর্শে আসেন । ছাত্র জীবনে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া তিনি সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক বই পড়তে ভালবাসতেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাবিধ কারণে তিনি স্নাতক ডিগ্রী পড়াশুনা বন্ধ করে বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ সনে প্রথম দিকে রাঙ্গামাটি ফিরে আসেন । এরপর স্বর্গত কামিনী মোহন দেওয়ান প্রমুখ রাজনীতিবিদ–এর সহকর্মী হয়ে তিনি রাজনীতি চর্চা শুরু করেন । স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৪ সনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুড্ডিষ্ট কমিউনিটির প্রার্থী স্বর্গত কামিনী মোহন দেওয়ানের পক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সভা করে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ গ্রহণ করেন । তাঁর মত

বিচক্ষণ রাজনৈতিক কর্মীর জন্যেই স্বর্গত কামিনী মোহন দেওয়ান সেবারের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে M. L. A. পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পর তাঁর নিজ গ্রামের M. E. স্কুলটি জুনিয়ার হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পর সেখানে ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত তিনি সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। তদানীন্তন খাগড়াছড়ি M. E. স্কুলটি ১৯৪১ সন থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত চালু থাকার পর স্কুলটি জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। তখন পন্ডিত বিপুলেশ্বর দেওয়ান ছিলেন খাগড়াছড়ি জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁরই আমন্ত্রণে স্বর্গত দেওয়ান মগবান স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে খাগড়াছড়ি জুনিয়ার হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পন্ডিত বিপুলেশ্বর দেওয়ান এর সান্নিধ্যে এসে তিনি স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করেন নাই। খাগড়াছড়ি জুনিয়ার হাই স্কুলকে ১৯৫৭ সনে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। সে বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষায় External Cendidate হিসেবে অংশ গ্রহণ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। আবেদন অনুসারে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ১৯৫৮ সনে অনুষ্ঠিত B. A. পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পন্ডিত বিপুলেশ্বর দেওয়ান খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার পর তিনি ১৯৫৯ সন থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। যতদুর জানা যায় স্কুলের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে কিছুদিন কাচালং উপত্যাকায় ঠিকাদারীর ব্যবসা ও করেছিলেন।

দীঘিনালা হাই স্কুলের তৎকালীন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু কিরণ বিকাশ দেওয়ান থেকে জানা যায় ১৯৬০ সনে দীঘিনালা M. E. স্কুলকে জুনিয়ার হাইস্কুলে উন্নীত করার পর একজন স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, স্কুল কমিটির সেক্রেটারী অশ্বিনী কুমার দেওয়ান এর আমন্ত্রণে স্বর্গত দেওয়ান দিঘীনালা জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এক বছর পর তিনি দিঘীনালা জুনিয়ার হাই স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে ১৯৬২ সন থেকে ঐ স্কুলে নবম শ্রেনীর ক্লাশ চালু করেন' প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বর্গত দেওয়ান দিঘীনালা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং সময়োপযোগী গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। কিন্তু স্কুল পরিচালনা কমিটির তৎকালীন কর্মকর্তাদের সাথে মতানৈক্যের কারণে ১৯৬২ সনের মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিঘীনালা থেকে খাগড়াছড়ি চলে আসেন। এর পরই

তিনি C. O. (Dev) এর চাকুরী নিয়ে রাঙ্গুনীয়া থানায় কিছুদিন সরকারী চাকুরী করেন। তারপর ১৯৬৩ সনে খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুনরায় সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করে পুনরায় শিক্ষকতার পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি একনাগাড়ে ১৪ (চৌদ্দ) বছর যাবত খাগড়াছড়ি স্কুলে নীরবভাবে শিক্ষকতা করেছিলেন। সহকারী শিক্ষক পদে দায়িত্বপালন কালে ১৯৬৫ সনে East Pakistan Education Extension Centre, Dhaka থেকে তিন মাসের একটি বিশেষ কোর্স সম্পর্ণ করে উক্ত কোর্সে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছিলেন। খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করেন। তিনি ১৯৭৭ সনে তাঁর খবং পুরিয়াস্থ গ্রামকে স্বনির্ভর গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলে তৎকালীন স্বনির্ভর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রশংসাপত্র অর্জন করেন। আজও তাঁর গ্রাম স্বনির্ভর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আসছে। বস্তুনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বক্তব্যে তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় মেলে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ১৯৭৮ সনে পৃথকভাবে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনৃষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আরণ্য জনপদের লেখক জনাব আবদুস সাত্তারকে ইনৃষ্টিটিউটের পরিচালক পদে বহাল করেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আলী হায়দার খাঁন সাহেব সরকারের নিকট স্বর্গত অশোক কুমার দেওয়ানকে ইনৃষ্টিটিউটের পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব অনুসারে তাকে ইনৃষ্টিটিউটের পরিচালকের পদ পূরণের জন্য আহবান করা হয়। কিন্তু তাঁর সেই পুরনো প্রতিষ্ঠানিক প্রধানের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচালকের পদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু এ পদে একজন উপজাতীয় প্রার্থীকে মনোনীত করার জন্য উপজাতীয়দের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন ডিসি জনাব আলী হায়দার খাঁন সাহেবের সুপারিশক্রমে সরকার স্বর্গত দেওয়ানকে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনৃষ্টিটিউটের প্রথম পরিচালক জনাব আবদুস সাত্তারের স্থলাভিষিক্ত করেন। ইনৃষ্টিটিউটের নতুন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একীভূত করেন এবং ইনৃষ্টিটিউটে স্থাপন করেন একটি পাঠাগার একটি উপজাতীয় ঘাদুঘর। ইনৃষ্টিটিউটে পরিচালক পদের দায়িত্বের পাশাপাশি নিজেকে গবেষণায় নিয়োজিত করেন। ইনষ্টিটিউট থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত উপজাতীয় গবেষণা প্রত্রিকার ১ম সংখ্যায় তার প্রথম গবেষণা মূলক রচনা "চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক" লিখেই তিনি

চাকমা জাতির ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। বর্তমান পান্ডুলিপি ছাড়া অসমাপ্ত অবস্থায় তিনি লিখে গেছেন "চাকমা ভাষার শব্দকোষ" এবং "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" দ্বিতীয় অধ্যায়। মৃত্যুর চার মাস আগে মোনঘর শিশু সদনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপজাতীয় সাহিত্য, শিল্পকলার আঙ্গিক রূপের বিশ্লেষণধর্মী পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরেছেন তা নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস গবেষণায় নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করার উৎসাহ যোগাবে। এযাবত বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রকাশিত গবেষণাধর্মী ইতিহাস রচনাবলীর সাথে তাঁর গবেষণা নিবন্ধগুলোর অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তার ঐ সমস্ত পান্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করে মূখ্য আলোচক হিসেবে পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। রাঙ্গামাটি কলেজে অনুষ্ঠিত উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে তিনি চাকমা উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখে উপস্থিত সুধীজনদের কাছে যে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তা স্মরণযোগ্য।

স্বর্গত দেওয়ান এর অবশিষ্ট অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি প্রকাশের জন্য সমাজ সচেতন ব্যক্তিগণের এগিয়ে আসা উচিত এবং এযাবত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পরিবেশিত তাঁর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে স্মারকমালা গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

স্বর্গত দেওয়ান গ্যাষ্ট্রিক আলসার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ই জুন/১৯৯০ইং তারিখে বিকাল ৫ ঘটিকায় চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী, দু'পুত্র ও এক কন্যাসহ অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁরই আদর্শ ও প্রেরণায় উজ্জিবীত তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র মিঃ সমীরণ দেওয়ান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান। দু'পুত্রের মধ্যে ১ম পুত্র খাগড়াছড়ি কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় পুত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের ছাত্র। একমাত্র কন্যা খাগড়াছড়ি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রাক্তন সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অগণিত অনুরাগী সহ খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার শরীফ আজিজ পি-এস-সি, জেলা প্রশাসক জনাব শামসুল করিম ও স্থানীয় সরকার পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান মিঃ সমিরণ দেওয়ান তাঁর আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১· ঘোষ, সতীশ চন্দ্র ঃ চাকমা জাতি, কলিকাতা–১৯০৯ ইং

২· চাকমা, মাধব চন্দ্র ঃ শ্রী শ্রী রাজনামা, আগরতলা–১৯৪০ইং

৩· তালুকদার, প্রাণহরি ঃ চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস, রাঙ্গামাটি–১৯৮১ ইং

৪· চাকমা, সুসময় ও চাকমা, সুগত ঃ রাধামহ্ন–ধনপুদি (প্রথম পর্ব), মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, জাবি, ঢাকা–১৯৮০ ইং

৫· চাক, মং মং ঃ চাক উপজাতি পরিচিতি, গিরিনির্ঝর, ১ম সংখ্যা, উসাই। রাঙামাটি–১৯৮২ইং

৬· দেওয়ান, বিরাজ মোহন ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙামাটি–১৯৬৯ইং

৭· রায়, রাজা ভুবন মোহন ঃ চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, রাঙামাটি–১৯১৯ইং

৮ Hutchinson. R. H. S Chittagong Hill Tracts districts gazettear-1909 (Reprinted in Delhi 1978)

৯· Lewin, Captain T. H. The Hill Tracts of Chittagong and dwellers therein Calcutta-1869

১০. Phayre, Sir A. P. History of Burma, London-1883

১১· Cotton, H. S. Memorrendum on the Revenue history of Chittagong.

১২· Hutchinson, R. H. S. An accont of Ctg. Hill Tracts-1906.

১৩· Phayre, Lient A. P. An account of Arakan: Journal of the Asiatic Society of Bengal

1841, Vol. No. 117

১৪· চাকমা, নোয়ারাম ঃ পার্বত্য রাজলহরী, রাঙ্গামাটি ১৯৬২ ইং

১৫· চাকমা, পূণ্যধন ঃ চাকমা ইতিহাস, অরুণাচল–১৯৮২ইং।

১৬· **Forbes, Cpt. C. J. F. S.** Legendoy history of Burma and Arakan-Rengun, 1882.

১৭· **Harvey, G. E.** Bayinnaung's living Descendent, Journal of the Burma Reseach Society, 44 (1)

১৮· **Grierson, G. E.** Linguistic Survey of India, Vol. I, part-I, P-77

১৯· **Hadgson B. H.** On the Indo-chinese boarders and their connection with the Himalayan and Tibetan, Journal of the Asiatic Society, Vol, XX II (I), 1853.

২০. **Chatherjee, Dr. S. K.** Kirata Jana kriti, reprint-Cal-1974

.....ইতিহাসের পথের রেখা খুঁজে নিতে হবে। সে পথের রে
যতই অস্পষ্ট হউক, যতই দুর্লক্ষ্য হউক আশা করি প্রয়োজ
নিষ্ঠা সহকারে অনুসন্ধান চালানো হলে সঠিক পথের রেখা